CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

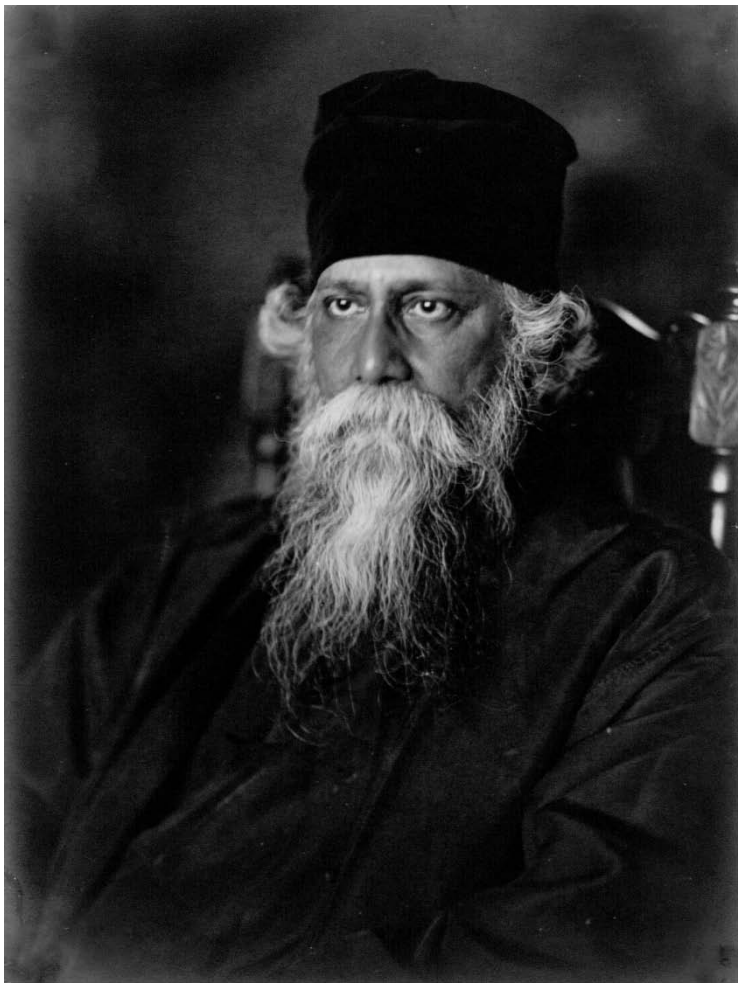

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.C	Units
1	1.3	1–8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata – 700050, Phone - (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sibaji Pratim Basu	Professor	Department of Political Science with Rural Administration, Vidyasagar University
Asru Ranjan Panda	Retired Professor	Department of Political Science, Scottish Church College, University of Calcutta
Sankar Bhunia	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Eyasin Khan	Assistant Professor	Department of Political Science with Rural Administration, Vidyasagar University
Rima Chatterjee	Assistant Professor	Department of Political Science, Gurudas College, University of Calcutta

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sumit Mukherjee	i)Professor, Department of Political Science & ii)Director, Centre for Studies on Bengali Diaspora	i) Department of Political Science University of Kalyani & ii)Centre for Studies on Bengali Diaspora, University of Kalyani

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

March, 2021 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

Printed at East India Photo Composing Centre

69, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006

C.C : 1.3
Politics in Ancient and Medieval India

Contents

Unit 1.	Politics of Dharma: Moral Dilemmas and unresolved Conflicts in the Epics	1-11
Unit 2.	Politics of Reigning/Kingship	12-18
Unit 3.	Politics of Rituals: Yajna through the Ages	19-26
Unit 4.	Politics of Danda: From a Narrative of Punishment to a Narrative of resistance	27-34
Unit 5.	Kautilya's Saptanga Theory	35-43
Unit 6.	Kautilya's Mandala Theory	44-51
Unit 7.	Politics of Islamic Paradox: Contrasting views of Kingship	52-63
Unit 8.	Akbar's Concept of Din-i-ilahi	64-69

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-1

ধর্মের রাজনীতি : মহাকাব্যের আলোকে নৈতিকতার উভয়সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধ
Politics of Dharma : Moral Dilemmas and unresolved Conflicts in the Epics

বিষয়সূচি :

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ ধর্মের রাজনীতি : সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

১.৪ ধর্ম ও রাজনীতি : নৈতিকতা ও সম্পর্কের টানাপোড়েন

১.৫ ধর্ম-রাজনীতি : নৈতিকতার উভয় সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধ

১.৬ রামায়ণে রাজনীতি

১.৭ মহাভারতে রাজনীতি

১.৮ মধ্যযুগের ধর্ম-রাজনীতি : নৈতিকতার প্রেক্ষিত

১.৯ মূল্যায়ন

১.১০ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের প্রকৃত চরিত্র, নৈতিকতার দ্বিবিধ ভক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। তাছাড়া, এই এককের নিবিড় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধর্মের রাজনীতির বিষয়বস্তু এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকাব্যের আলোকে নৈতিকতা উভয় সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে।

১.২ ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম সভ্যতাগুলির অন্যতম—এ ব্যাপারে ইতিহাসগত ভাবে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় সভ্যতার অসাধারণ সম্পদ তার আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতার মূলে আছে

ত্যাগ এর আদর্শ। প্রাচীন ভারতে ভারতবাসীর সকল প্রকার কার্যকলাপ এমনকি রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্যকলাপ এই ত্যাগের মহিমার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু রাষ্ট্র নায়ক যারা বিপুল শক্তিশালীভাবে রাষ্ট্রকে সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারাই স্বেচ্ছায় রাজমুকুট ত্যাগ করে পার্থিব সুখ বিলাস বিসর্জন দিয়ে অধ্যাত্ম চিন্তায় মনোনিবেশ করেছিলেন। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সম্রাট অশোক-এর ঐতিহাসিক উদাহরণ। মহাপরাক্রমশালী সম্রাট হর্ষবর্ধন একদিকে ক্ষত্রিয় শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, অপরদিকে সুমহান বৈরাগ্য ও ত্যাগের সন্ন্যাসীর চির বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যে এই জীবন চর্চার পরিচয় মেলে। মহাভারতের যুদ্ধের পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ রাজপরিবারের সদস্যরা এবং তার কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপান্ডব সসাগরা পৃথিবীর রাজ চক্রবর্তী হয়েও সংসার পরিত্যাগ করেছিলেন। এইরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। অতীত ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণের চালিকাশক্তি ছিল এই আধ্যাত্মদর্শন ও সুমহান ত্যাগ। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার কারণে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির কোনওরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। পরন্তু এই আধ্যাত্ম সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা হত।

একথা সর্বজনবিদিত যে উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে কোনও সম্পদ রক্ষিত হতে পারে না। আন্বীক্ষীকিরূপ পরিপুষ্টির জন্যে বীতরাগ মুনি অক্ষপাদ ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন, যার দ্বারা রাজ্য রক্ষিত হতে পারে। অর্থাৎ, ঋষি বীতরাগ হলেও অধ্যাত্মবিদ্যার রক্ষার জন্যে রাষ্ট্রনীতিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিলেন এবং তার অঙ্গ হিসাবে জল্প, বিতন্ডা অর্থাৎ ছল, জাতিনিগ্রহ, প্রতারণা ইত্যাদি উপায়ের কথা বলেছিলেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতে অর্থ-সম্পদ রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন স্বীকৃত ছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণের প্রধান দুটি ধারা ছিল। একটি ধর্মশাস্ত্র ধারা, অপরটি অর্থশাস্ত্র ধারা। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার আদি ধারাটি ছিল ধর্ম শাস্ত্র, যা প্রধানত বৈদিক সাহিত্য, সংগিতা, ব্রাহ্মণ ও ধর্মসূত্রসমূহকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই ধর্মশাস্ত্র ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় বিধান ও নৈতিকতাই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি ও চালিকাশক্তি। রাজ্য শাসনের বৈদিক দর্শনের কোনও প্রকার বিচ্যুতি অনুমোদিত ছিল না। সময়ের পরিবর্তনের হাত ধরে ধর্মীয় অনুশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অর্থশাস্ত্র ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অর্থশাস্ত্র ধারা ধর্মীয় বিধানকে অগ্রাহ্য করেনি। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধর্মীয় বিধানকে লঙ্ঘন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সমাজের প্রচলিত প্রথা, জনমত ও সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উপযোগের ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠায় অর্থশাস্ত্র ধারার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ছিল।

তবে বিকাশের হাত ধরে সামগ্রিক ধর্মীয় রাজনীতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, নৈতিকতা ও রাজনীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আসে। বিশেষ করে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে তা অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে শাসকদের চরিত্রগত পরিবর্তন এক্ষেত্রে বিচার্য। আমরা উক্ত প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় রাজনীতির নানাবিধ দিক নৈতিকতা ও দ্বন্দ্বের বিষয় সমূহ আলোচনা করব।

১.৩ ধর্মের রাজনীতি : সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

প্রাচীন ভারতে ধর্ম শব্দটির ব্যঞ্জনা ছিল। ধর্ম বলতে শুধু শাস্ত্রীয় অনুশাসন বোঝাতো না। শাস্ত্রীয় অনুশাসন অপেক্ষা তা আরও অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। ধর্ম অনুশাসনের সৃষ্টি করে এবং অনুশাসন ধর্মের অধিষ্ঠিত। ধর্ম পর-জগত সম্পর্কীয় কোনও তত্ত্ব নয়। উৎপত্তিগতভাবে ধর্ম কথাটির উদ্ভব ‘ধূ’ ধাতু থেকে ‘ধৃ’ ধাতুর আভিধানিক অর্থ ধারণ করা, দৃঢ় সন্নিবদ্ধ করা, উর্ধ্বে তুলে ধরা ইত্যাদি। যা ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম। বিশেষ অর্থে যা সমাজকে ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম। ধর্মশাস্ত্র ধারা অনুগামী বিশিষ্ট পন্ডিতগণ ধর্ম বলতে কোনও বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মমতকে বোঝান

প্রকৃত অর্থে সমাজ বিজ্ঞানীদের ধর্ম সম্পর্কে বহুধা বিভক্ত উপলব্ধি ‘ধর্ম’ প্রত্যয় তথা ধারণার জটিলতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। এক্ষেত্রে ভাবনাগুলিকে স্থায়ী (Substantive) ও কার্যকরি (Functional) বক্তব্য রূপে শ্রেণীকরণ করলে মনে

হয় ধর্ম সম্পর্কিত চর্চায় কিছুটা হলেও সঠিক দিশা দান করা সম্ভব হবে। স্থায়ী ধরনের ভাবনাগুলি মূলত স্থায়ী সমাজ আলোকে ধর্মের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে একে একটি প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করে। অন্যদিকে কার্যকরি ভাবনায় বলা হয়েছে, যে ধর্ম হল (ক) একটি প্রতীকী ব্যবস্থা, (খ) যা ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতাশালী দীর্ঘস্থায়ী উদ্দীপনা জাগাতে চায়, (গ) যেখানে ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়; (ঘ) যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবন চালায় এবং (ঙ) নিজস্ব আত্মোলব্ধি করে; গুণগত ভাবনার পাশাপাশি পরিমাণগত দিক থেকেও কার্যকরি সংজ্ঞা ব্যক্তির সমাজ জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে ওঠে। তাছাড়া, ধর্মের সর্বজনীন সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, ধর্ম যে একটি বিশ্বাস ব্যবস্থা তা নিয়ে মনে হয় খুব একটা তর্ক করা যায় না। কারণ যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ধর্ম আচার পালন করতে চায় তাদের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাসই হল ধর্মীয় ভাবনার মূল উপজীব্য। আবার যারা নাস্তিক-ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না তাদের কাছেও ঈশ্বর অবিশ্বাস এর বিশ্বাস মনন গভীরে ক্রিয়া করে তখন তারাও আরেক ধরনের বিশ্বাসে আক্রান্ত হন যা প্রকৃতই এক অর্থে ধর্ম। সুতরাং ধর্ম কি? নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে এর যেমন এক বাক্যে উত্তর দেওয়া কষ্টসাধ্য ঠিক তেমনি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ধর্মের উৎপত্তি ও চরিত্র নিয়েও সমাজ বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত বিশেষ করে যখন আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার আলোকে ধর্মের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি সেখানে নানাবিধ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত যার সামগ্রিক সংজ্ঞা ও অর্থের মীমাংসা এখনও হয়ে ওঠেনি।

প্রাচীন ভারতে ধর্ম বলতে বোঝাত এক বিশেষ জীবনচর্চা এবং আচার-আচরণের নিয়মাবলী যা ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের পার্থিব কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে মানুষ ক্রমে ক্রমে স্বীয় বিকাশের মাধ্যমে সার্বিক অগ্রগতি লাভ করে এবং মনুষ্য জীবনের অভিপ্রেত মোক্ষ লাভের লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সামগ্রিকভাবে সমাজের মঙ্গল সাধন লাভ করে। ধর্মের এই উদার ব্যাখ্যা ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টি জীবনকে একসূত্রে গ্রথিত করে মানুষকে তার অভীষ্ট ও অভিপ্রেত অগ্রগতির প্রেরণা দেয়। প্রাচীন ভারতে মনে করা হত ব্যক্তি ও সমাজের এই মানবিক ধর্মকে রক্ষা করাই রাজা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কর্তব্য। চতুরাশ্রম ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে; ব্রাহ্মণ্যবাদী চতুর্বর্ণ সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বর্ণাশ্রমের মূলস্বরূপ ধর্মের দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রনীতির সার্থকতা সম্পাদন করে। আবার উপযুক্ত দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত ধর্ম রক্ষিত হয় না—চতুরাশ্রম বা চতুর্বর্ণ পালিত হয় না। তাই প্রকৃত দণ্ডধর হয়ে বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষা করাই রাজার কর্তব্য। সুতরাং প্রাচীন ভারতে ধর্ম ও দণ্ড (রাষ্ট্রনীতি) পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করা হত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধর্মের এই ব্যাপক অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তারা ধর্মকে সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ও পারোলৌকিক অনুসন্ধান এবং অধিবিদ্যা হিসেবেই দেখেছিলেন। এই কারণেই তাদের কাছে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে ঈশ্বরীয় অধিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, তৎকালীন শাসকবর্গ ধর্ম কর্তৃক যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। এই যুগেও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় নৈতিকতার সংযুক্তি ছিল যা আমরা যথাস্থানে চর্চা করব।

১.৪ ধর্ম ও রাজনীতি : নৈতিকতা ও সম্পর্কের টানাপোড়েন

এই পর্বে আমরা ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের টানাপোড়েন ধর্ম কেন্দ্রীক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চার আলোকে দেখার চেষ্টা করব। উল্লেখ্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম ও রাজনীতির আলোচনায় এই মডেল অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়েছে যা আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রাজনীতির প্রবাহ পথে পেয়ে থাকি।

সমসাময়িক অর্থে, ধর্ম ও রাজনীতি হল দুটি পৃথক মেরুর বিষয়। ধর্মের সংজ্ঞা ও চরিত্র নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মার্কসবাদী দর্শন ব্যতিরেকে প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানীই মনে করেন ধর্ম হল আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়। ধর্মের মূল কথা হল বন্ধন, ভক্তি বা বিশ্বাস। অন্যদিকে রাজনীতি হল সম্পূর্ণভাবেই এই জগতের চর্চা তথা পার্থিব বিষয়। রাজনীতির কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল ক্ষমতা ও ক্ষমতার বণ্টন পাঠ। আবার ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সমন্বিত গোষ্ঠীবদ্ধ রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনকে কেন্দ্র করে যত প্রকার কার্যকলাপ ঘটে তার সবই রাজনীতির আলোচ্য বিষয়।

বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অ-পার্থিব ধর্ম এবং পার্থিব রাজনীতিই বিবর্তনের পথে মানব সভ্যতাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে। আবার মানব সমাজের অন্যতম নির্ধারক এই দুই শক্তির মধ্যকার সম্পর্কও অম্লমধুর। কথনও ঘনিষ্ঠতা আবার কখনও বা দূরত্ব তথা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তাসত্ত্বেও এই দুটি ধারণার একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে এবং অপরটি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, ধর্মীয় অনুশাসন, ধর্মের প্রসার সাধন এবং ধর্মীয় নীতি অনুসারে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মানব সভ্যতার আদিম স্তর থেকে ধর্মের উত্থান ও বিকাশ সূচিত হয়েছে। মূলত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরম্পরাগত ধারা, আধি-ভৌতিক শক্তির ধারণার উপর বিশ্বাস মানব সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। ধর্মীয় নির্দেশনা, অনুশাসন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানব সভ্যতার যত বিকাশ ঘটেছে তার সঙ্গে তাল রেখে ধর্মের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস চেতনা সমাজ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে নানা পরিবর্তন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের দ্বৈততা (duality) কে আমরা ধর্মতন্ত্র ভিত্তিক রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্র তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণযুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আলোকে পর্যালোচনা করতে পারি। ধর্মতত্ত্বভিত্তিক রাজনীতির উৎস নিহিত রয়েছে প্রাচীন সমাজের ধর্মীয় ধ্যান ধারণা মধ্যে যার মূল বিষয় হল এক ধরনের ক্ষমতা ভিত্তিক রাজনীতি। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি হল বাস্তব শাসন উপলব্ধি তথা যুক্তিবাদের নিরিখে মানুষের সমস্ত ধরনের পরিচিতি কে অস্বীকার করে শুধু মানব পরিচিতিকে গুরুত্ব দান এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ।

এক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ তথা অর্থশাস্ত্র কেন্দ্রিক শাসন রাজনীতির তথা পার্থিব রাজনীতির নানাবিধ প্রকরণ আমরা দেখি তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চায় একটু ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক যে সন্দর্ভ (discourse) তাতে ধর্ম রাজনীতির সম্পর্কের দ্বৈততার (duality) নির্মাণ প্রকল্প ভিন্নতা অনুসারী। তারা মনে করেন ধর্মতত্ত্বকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তা, অনুশাসন ও আদর্শকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় নির্মাণ কার্য ও তার লক্ষ্য, নীতি, উদ্দেশ্য এবং দর্শন গড়ে ওঠে। প্রাচীন যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় যে রাজনীতি ও ক্ষমতার দর্শন গড়ে উঠেছিল তা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রাষ্ট্র পরিচালিত ধর্মীয় অনুশাসনের আচরণ। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মতাত্ত্বিক রাজনীতি জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তবে মধ্যযুগের শেষ পর্বে ধর্ম ও চার্চের সঙ্গে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব সামনে আসে। বস্তুত পশ্চিমী দর্শনে নবজাগরণ উত্তর আলোকায়নের হাত ধরে এগোতে থাকা যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজ ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতি থেকে সরে আসতে থাকে। তবে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার নিরিখে ধর্মতত্ত্বভিত্তিক রাজনীতির মধ্যে যেমন প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষতার উপস্থিতি কিছুটা হলেও ছিল বলে অনেকে মনে করেন ঠিক তেমনি অর্থশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক রাজনীতির সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে, এ কথা ঠিক যে, ধর্মের স্থায়ী (Substantive) তথা কল্যাণকামী সংজ্ঞা দানকারীদের কাছে ধর্ম রাজনীতি হল কল্যাণের এক মাধ্যম অন্যদিকে ধর্মের কার্যকরি (Functional) সংজ্ঞা দানকারীদের কাছে ধর্ম হল উদ্দেশ্য পূরণের এক মাধ্যম তথা উপায়। ফলে ধর্ম সম্পর্কে এই দ্বিবিধ অনুভবই আসলে ধর্ম রাজনীতির চর্চায় নানা ধরনের উপাদান নিয়ে আসে। ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায় :

ক) ধর্মতত্ত্বভিত্তিক রাজনীতির প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ নানা অনুশাসন;

খ) ধর্মতাত্ত্বিক রাজনীতিতে সাবেকিয়ানা ও কুসংস্কার ইত্যাদির প্রভাব থাকে;

গ) ক্ষমতা অর্জনে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা এখানে পরিলক্ষিত হয়;

ঘ) এই রাজনীতি বাস্তবতাবর্জিত আধিভৌতিক ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়;

ঙ) গণতান্ত্রিক আদর্শগুলির বাইরে সামাজিক অসাম্য ও বৈষম্য সৃষ্টি ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

চ) প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সেবা ধর্মের আদর্শ ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতিতে পাওয়া যায়।

ছ) আদপে, ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বুনিয়াদি ভাবধারা আলোকিত, অতিরঞ্জিত ভাবনার দিশারী কিছু কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনায় ধর্মীয় বোধকে কার্যকরি অর্থে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করে। ফলে ধর্মের সেবা আদর্শ রাজনীতির ক্ষমতালোভের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এক নতুন অভিজ্ঞান তৈরি করে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিক অর্থ সংক্ষেপে অনুধাবন করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে সমাজ ও রাজনীতির উপর থেকে ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় বিবেচনার স্থায়ীরূপ বিচার্য হলেও কার্যকরি বিষয়সমূহের উপরে অনাস্থা স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে রাজনীতিকে ঈশ্বর ও ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মীয় বিবেচনার পরিবর্তে মানুষের কল্যাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সর্বোপরি যেখানে বিশ্বাস এর পরিবর্তে যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের টানাপোড়েনকে সামনে রেখে আমরা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিণত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মীয় রাজনীতির মধ্যেকার নৈতিকতার উভয় সংকট ও অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারি।

১.৫ ধর্ম-রাজনীতি : নৈতিকতার উভয় সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধ

ধর্ম ও রাজনীতি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার বর্ণনায় নৈতিকতার উভয় সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধের বিবিধ দিক থেকে সামনে এসেছে। এক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র চিন্তা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মসূত্র সমূহে বর্ণিত রাষ্ট্র চিন্তার আলোকে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এমনকি V. P. Varma তার Ancient and Medieval Indian Political Thought গ্রন্থে Part-I "Ancient Indian Political Thought" শীর্ষক রচনার সবকটি অধ্যায় জুড়ে আলোচ্য বিষয়ের গভীর অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "The Dharmasastras, as exponents of the Vedic sacred tradition, glorify the aspect of Dharma-oriented quest of power. The Aitareya refers to various kings who attained supremacy in different quarters. The kingly power was sought to be strengthened with ritualistic legitimacy emanating from the sacrifices. Thus political role-taking and ritualistic legitimacy were combined. Manu, Yajnavalkya, Vishnu, Narada, Parasara and other writers of the Dharmasastras may be said to represent the Augustinian-Thomistic tradition in politics as differentiated from the more secularist and imperialist tradition typified by Kautilya and Brihaspati. The commentators and digest-writers accentuate the Dharmasastra notions. They however, are not noted for introducing innovations in the realm of political formulas. They also seek to perpetuate the Vedic and post-Vedic sacred traditions. Their works illustrate the supremely vital role of Dharma in Indian literature"

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ''প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রতত্ত্ব'' নামের নিবন্ধে আলোচ্য বিষয়ের একটা দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার ভাষায়, ''মহাভারত ও রামায়ণ এবং তৎসহ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মনু প্রভৃতির ধর্মসমূহের রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ক বক্তব্যসমূহ সর্বযুগের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। মহাভারতের যে বর্তমান চেহারা আমরা দেখি তা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের যদিও মহাভারত রচনা শুরু হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে। মহাভারতের শান্তি পর্ব ও অনুশাসনপর্ব প্রাচীন ভারতীয় রাজশাস্ত্র প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যেখানে রাজনীতি-শাস্ত্রের সৃষ্টি, রাজতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা, রাজ কর্তব্য, শাসন নীতি, চরনিয়োগ, সপ্তাঙ্গ ও ষাড়গুন্য তত্ত্ব, দন্ডনীতি, রাজমন্ত্রী নিরূপণ, পুর বা দুর্গ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, করনীতি, সমরনীতি, গণরাজ্য বা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। রামায়ণ, ধর্মশাস্ত্রসমূহ এবং

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে....রামায়ণের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক। ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতি ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে রচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে মনুস্মৃতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের চেয়ে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন স্মৃতি রচনাকাল ১০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।" সবদিক বিবেচনা করে প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্রসমূহের রাজনৈতিক মূল্য, নৈতিকতার সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধ সমূহের প্রতি সূত্রাকারে আলোকপাত করা যেতে পারে।

ধর্মসূত্রসমূহের বিষয়বস্তু মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গেই সম্পর্কিত। ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্ম বলতে আইন কানুন, বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি এমনকি আচার-ব্যবহারও বোঝায়, যেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়াই ধর্মসূত্রগুলির উদ্দেশ্য। ভারতীয় ঐতিহ্যে যে ত্রি-বর্গ (ধর্ম-অর্থ-কাম) বা চতুর্বর্গমূলক (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) জীবনচর্চার কথা বর্ণিত হয়েছে, তারই প্রারম্ভিক পর্যায়টি ধর্ম-সূত্রসমূহের উপজীব্য এবং সেই হিসাবে ধর্মসূত্রসমূহ আসলে পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রসমূহের আকর স্বরূপ।

এখানে সমাজদেহের অন্তর্গত প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের অধিকার, কর্তব্য ও ব্যবহারের এলাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যার বাইরে কেউ যেতে পারে না, এমনকি রাজাও নয়, তার উপর যে সকল সুনির্দিষ্ট কর্তব্যভার চাপানো আছে তারই প্রয়োজনে। রাজা ধর্মের রক্ষক। এই প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে সুপ্রাচীন অতীতে যখন রাষ্ট্র বা শাসক সৃষ্টি হয়নি তখন মানুষ ধর্মনিষ্ঠ ছিল, অর্থাৎ জীবন সংক্রান্ত স্বাভাবিক ন্যায়নীতি মেনে চলত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ধর্ম অধঃপতিত হল তাকে পুনরায় নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাষ্ট্র ও রাজার প্রয়োজন দেখা গেল। মোটামুটিভাবে ধর্মসূত্র সমূহের বক্তব্য হচ্ছে সমাজের অস্তিত্বের জন্যই রাজতন্ত্রের প্রয়োজন; রাজকীয় কর্তৃত্বের অভাবের ফলেই হিংসার উদ্ভব হয়; কিন্তু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সীমাহীন নয়। নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্যই রাজার প্রয়োজন, কিন্তু এই রাজতন্ত্র প্রজার সম্মতির উপর নির্ভরশীল। সার্বভৌমত্ব আসলে জনগণের, কেননা অত্যাচারী ও দুস্কৃতকারী রাজাকে বিতাড়নের অধিকার তাদের আছে। রাজার অধিকারসমূহ প্রকৃতপক্ষে জনগণের সঙ্গে রাজার দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পরিনাম, বৌধায়ন, গৌতম এবং বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র সমূহের মতে চুক্তির মূল কথা এই যে রাজার দিক থেকে রাজা প্রজাদের রক্ষা করবেন, প্রজাদের দিক থেকে সেই জন্যই রাজা কর দাবি করতে পারেন। মহাভারতে এই বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে রাজা তা গ্রহণ করে নিজের দায়িত্ব পালন করেন না তিনি আদপে তস্কর অর্থাৎ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব আদায়কারী চোর।

রক্ষণ ছাড়া রাজার আরেকটি মূল কর্তব্য হল দণ্ডদান তথা দণ্ডের প্রয়োগ। এক্ষেত্রে বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের বিংশতম অধ্যায়ে খুব স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাজার কোনও কারণে বিচ্যুতি ঘটে তাহলে রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আসলে দণ্ডনীতি প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হল ধর্ম অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের জন্য যে সুনির্দিষ্ট জীবন চর্চা বিভিন্ন ধর্মসূত্র সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে তা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে রাজাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গৌতম ধমসূত্রের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে রাজা যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে প্রজাদের পুণ্যের আংশিকভাগ তিনি পাবেন আর যদি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তাহলে প্রজাদের পাপের দায়ও তাকে বহন করতে হবে। এক কথায় রাজা হলেন সকলের সাধারণ অভিভাবক, সুতরাং নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজার সঙ্গে প্রজাদের একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন আছে। সকল ক্ষেত্রেই তাঁর কিছু অধিকার আছে এবং অভিভাবক হিসেবে তিনি যে কোনও গৃহে আতিথ্য লাভের অধিকারী। তাঁকে নাম ধরে ডাকা চলে না এবং তাঁর মৃত্যুতে সকলকে অশৌচ করতে হয়। রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং রাজ হত্যা তাই মহাপাপ। তবে ধর্মসূত্রসমূহের বেশ কিছু বক্তব্যে এক্ষেত্রে স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়, কেননা তত্ত্বের দিক থেকে ধর্মসূত্র সমূহে একথাও বলা হয়েছে যে অত্যাচারী এবং রাজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত রাজাকে বিতাড়ন করার অধিকার প্রজার আছে। কিন্তু বাস্তবে রাজা যেহেতু অসম্ভব ক্ষমতাবান তাই তাঁকে ধর্মসূত্রকার গণ সহজে স্বীকার করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে, আরও বলা যায় যে, রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকার দরুন তাঁকে সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া

হয়েছে এবং তাঁকে কোনও আদালতে তলব করা যাবে না এবং তার সম্পত্তি কেউ ভোগ করতে পারবে না অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় ধর্মসূত্রসমূহে রাজার সম্পর্কে সামগ্রিক বিরোধের মীমাংসা হয়নি।

আবার, কর বা বলি আদায়ের ক্ষেত্রেও বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের মতে রাজা প্রজাকে নিরাপত্তাদান ও রক্ষার বিনিময় উৎপন্ন ফসলের শতাংশের অধিকারী। তবে গৌতম ধর্মসূত্রের মতে তা অষ্টমাংশ বা দশমাংশ ও হতে পারে। সঞ্চিত অর্থ এবং সুবর্ণের উপর রাজা কর গ্রহণ করতে পারেন। এমনকি, গুপ্তধন, আবিষ্কৃত ধন, হারানো এবং ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তির সম্পত্তিতে রাজার অধিকার আছে। এছাড়াও কারিগরদের ও কর দিতে হত। এই নীতিগুলি আধুনিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও দেখা যায়। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে করদানের ক্ষেত্রে রাজার উপর কিছু দায় দায়িত্ব আরোপিত করা হয়। রাজা যে কর্তব্যগুলি পালন করবেন তারমধ্যে অন্যতম হল—তিনি সৎ ও ন্যায় পরায়ন থাকবেন, প্রজাদের কল্যাণের উপর নজর রাখবেন, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করবেন, নিরপেক্ষভাবে দন্ড প্রদান করবেন, কোনও বিলাস ব্যসনে লিপ্ত হবে না, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাদের কথা শুনবেন, অন্যায্য কর চাপাবেন না, জনমত সম্পর্কে সজাগ থাকবেন, শোত্রিয়, অনাথ, বিধবা ও দুস্থদের মঙ্গল করবেন, বার্তা বা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকে নজর দেবেন এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা করবেন।

রাজার নিরঙ্কুশ প্রতিযোগী না হলেও প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজ নৈতিকতার আলোকে ব্রাহ্মণরা কিছুটা হলেও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক শক্তি প্রজাদের সঙ্গে রাজার সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। গৌতম ধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ এবং রাজা উভয়েই রাষ্ট্রের রক্ষক। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণদের কর মকুব করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে যেহেতু ব্রাহ্মণগণ তাঁদের শাস্ত্রীয় কর্মকান্ডের দ্বারা রাষ্ট্রের নানাবিধ আপদ দূর করেন তাই তাঁদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। ব্রাহ্মণগণ নৈতিক জীবন-রক্ষক, ধর্মের জটিল রহস্য ব্যাখ্যা করেন এবং তপস্যা শক্তির দ্বারা শান্তির প্রবাহ রক্ষা করেন তাই বলা যায় তাদের এই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এককথায় ধর্মশাস্ত্রের বৈদিক ঐতিহ্য পরবর্তী সময়ে ধর্মসূত্রে প্রসারিত হয়। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হয়েছিল প্রধানত সেগুলিই ধর্ম সূত্রের আলোচ্য। এখানেও সুসংবদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো প্রতিষ্ঠার যুক্তিশীল তত্ত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও স্মৃতি অংশে ধর্ম তথা রাজধর্মের গুরুত্বপূর্ণ চর্চা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মনুস্মৃতির আলোচনা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ড. ভারতী মুখার্জী তাঁর প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা নামক গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে আলোচ্য বিষয়কে গভীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায়, ''পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন তখনও ভারতের স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির আকর গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। ফলত অর্থশাস্ত্র ধারা সম্পর্কে কোনও ধারণাই তখন ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উৎস হিসাবে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন। এই ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রগুলির ভিত্তি ছিল ধর্ম এবং দর্শন-একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রের পঠন-পাঠনের ও ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। প্রধানত এই কারণেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকট ভারতবর্ষ একটি অধ্যাত্ম ভাবনা সম্পন্ন দেশ ও ভারতবাসী শুধু পরজগৎ সম্পর্কীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে উৎসাহী—এই রূপ একটি ধারণা গড়ে ওঠে। এইসব কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত জীবন সম্পর্কে যে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি আভাষিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টিবহির্ভূত থেকে যায়।''

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনা উপস্থাপিত হয়। কৌটিল্যের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে নৈতিকতা ও দর্শনকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনা বিকশিত হয়েছিল, কৌটিল্য তা সুসংবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করেন। আসলে কৌটিল্য পূর্বতন সকল বিদ্যা চর্চাকে চারটি ভাগে ভাগ করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তিনি আন্বিক্ষীকি তথা সাঙ্খ যোগ্য এবং লোকায়ত দর্শনের মধ্যকার অধিবিদ্যা এবং দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেন;

ত্রয়ী তথা ত্রিবেদ অন্তর্ভুক্ত ধর্মের ভাবনা; বার্তা তথা কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড; এবং দণ্ডনীতি তথা শাস্তি বিধানের নীতি যা রাজনীতি বিজ্ঞান। নানাবিধ যুক্তিজাল নির্মাণ করে তিনি দর্শন, ধর্ম ও অর্থনীতির নির্ভরশীলতা সামগ্রিকভাবে নীতির উপর-তা প্রমাণ করেছেন। আসলে, কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞানের এক অন্যতম বস্তুনিষ্ঠ তাত্বিক। ফলে রাজনীতি শাস্ত্রে প্রাণ বিষয় দণ্ডনীতি তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কৌটিল্য অনুশাসনের ও চারটি উৎসবের উল্লেখ্য করেছেন, যথা—ধর্ম, ব্যবহার, চরিত্র ও রাজ্য শাসন। তিনি কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যদি কোনও ক্ষেত্রে ধর্মানুশাসনের সঙ্গে রাজ্যানুশাসনের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সঙ্গে রাজ প্রণীত আইনের সংঘাত দেখা দিলে রাজ আইন বলবৎ হবে।

প্রসঙ্গত, অর্থশাস্ত্র ধারার বক্তব্য পরবর্তী সময় নীতিসার ধারায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে কামন্দক এর নীতিসার ও 'শুক্রনীতিসার' এ ধর্মনিরপেক্ষ বোধ ও বক্তব্য উঠেছে। শুক্রাচার্য দৈব বা ঈশ্বরীয় বিষয় এর দ্বারা রাষ্ট্র চিন্তা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন। নীতিসার এর এক স্থানে তিনি বলেছেন, ''জ্ঞানী রাজারা পৌরুষকে সম্মান করেন, কিন্তু দুর্বল রাজারা দৈব বা ভাগ্যকে অর্চনা করে।"

আসলে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার যে সুগভীর দর্শনগত ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য তার প্রকাশ পাওয়া যায় ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের বাতাবরণে নৈতিকতার দ্বিবিধ অনুধাবন এবং অমীমাংসিত বিরোধের মধ্যে। এক্ষেত্রে ড: ভারতী মুখার্জী যথার্থই লিখেছেন, ''উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এই সত্যটি প্রমাণিত যে, প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ধারাকে ধর্ম ও দর্শনের উপাঙ্গ হিসাবে চিহ্নিতকারী পণ্ডিতগণের, বিশেষ করে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতবাদ সর্বাংশে সঠিক নয়। রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান ধারণা বিকাশের ঊষাকালে অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের একেবারে প্রথম যুগে ধর্মশাস্ত্রের ধর্মসূত্রের বিকাশের সময় রাজধর্মে দর্শন ও ধর্মের প্রভাব প্রগাঢ় থাকলেও, পরবর্তী যুগে অর্থাৎ 'অর্থশাস্ত্র' ও 'নীতিসার'-এর উন্মেষের ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান সর্বাংশে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অন্যনিরপেক্ষ, বিশেষত ধর্মনিরপেক্ষরূপ পরিগ্রহ করে।"

এই সময়েই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি হবে তা মোটামুটিভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আসলে একটু গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই বিষয়ে মনু, কৌটিল্য ও রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের বিশেষ বক্তব্যগত কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থেই রাজধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ, ষাড়গুন্য, তিন শক্তি, চার উপায় ও পঞ্চবর্গ এবং অষ্টাদশ এবং পঞ্চদশ তীর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

১.৬ রামায়ণের রাজনীতি :

রামায়ণের রচনাকাল নিয়ে নানা মত আছে। অনুমান করা হয় প্রায় ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্যরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করে। রামায়ণের রচনাকাল তার কিছু সময় পরে ধরা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দীপক কুমার নাগ তাঁর *মহাভারত ও রামায়ণে শাসন-রাজনীতি* নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, ''রাম-রাবণের যুদ্ধকে কেউ কেউ আসলে গাঙ্গেয় উপত্যকার কৃষিজীবী ও বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিবাসী শিকারি ও খাদ্য সংগ্রহকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ হিসেবে ধরে নিয়ে রামায়ণ কে আরও প্রাচীন বলে দাবি করেন। সেক্ষেত্রে এটা ধরে নিতে হয় যে পরবর্তী সময়ের কোনও সংকলয়িতা এই ঘটনার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার নাম জুড়ে দিয়েছেন। তবে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে রামায়ণের লঙ্কা প্রকৃতপক্ষে আজকের শ্রীলঙ্কা নয়। কর্ণাটকের কাছাকাছি কোনও বড়ো নদীর ধারে কল্পিত অথবা বাস্তব একটা পার্বত্য শহর।" আসলে রামায়ণের রচয়িতা, কাব্যগুণ ও সাহিত্যমূল্য আমাদের কাছে অতটা বিচার্য নয় যতটা এরমধ্যে কার রাজনৈতিক বক্তব্য, ধর্মসূত্রসমূহ সংক্রান্ত বিবৃতি, নৈতিকতার পরিসর এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, অধ্যাপক সুকুমার সেন এর বক্তব্য প্রণিধান্যযোগ্য। তিনি রামায়ণ প্রাচীনতম কিংবা মহাভারতের সমস্তরের বলে স্বীকার করেন না। তিনি লিখেছেন, ''রামায়ণ হল 'কাব্য' কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। আর মহাভারত হল 'ইতিহাস' লোকপরম্পরা প্রাপ্ত জনশ্রুতি।"

যাই হোক না কেন, রামায়ণের প্রণেতা হিসাবে বাল্মিকীর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। তবে এছাড়াও বর্তমানে আমাদের দেশে তামিল ভাষায় লেখা কুম্বনের রামায়ন, বাংলায় লেখা কৃত্তিবাস ওঝার 'রাম পাঁচালী' এবং আউধি উপভাষায় গোস্বামী তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' তিনটি রাম কথা খুবই জনপ্রিয়। দীপক কুমার নাগ খুব সুন্দরভাবে রামায়ণের চরিত্র ও রাজনীতির দিকসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায় ''বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাস ও তুলসী দাসের রামায়ণের কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য আছে। বাল্মিকির রচনায় আদর্শের প্রভাবসহ অসাধারণ কাব্য গুণের প্রতিফলন ঘটেছে। কৃত্তিবাস ও তুলসী দাসের রামায়ণে ভাবাবেগের প্রাধান্য বেশি। বাল্মিকি রামায়ণের 'যুদ্ধকাণ্ড'কে কৃত্তিবাস তুলসী দাস 'লঙ্কাকাণ্ড' হিসেবে দেখিয়েছেন। আবার বাল্মীকি ও তুলসী দাস প্রথম কান্ডটিকে 'বালকান্ড' বললেও কৃত্তিবাস তাকে 'আদিকান্ড' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মহাভারতে রাজ্যলোভ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পারিবারিক বিরোধ, জুয়াখেলা ইত্যাদি আর্য সভ্যতার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হলেও রামায়ণে কিন্তু ত্যাগ ও যৌথ পরিবারের আদর্শ চিত্রায়িত করা হয়েছে। আদর্শ রাষ্ট্রের একটা চিত্রও রামায়ণে পাওয়া যায়। তবে রাজ্যলাভ ও সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, রক্তপাত, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলো রামায়ণ ও মহাভারত-উভয় মহাকাব্যেরই মুখ্য অংশ জুড়ে দেখা যায়। দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ রামায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধ সুপ্রাচীন কিনা তা নিয়ে বারে বারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু রামায়ণে জন্মভূমিকে স্বর্গের চাইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করার মধ্য দিয়েই ভারতীয় জাতীয়তাবোধের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।" আদপে রামায়ণে রাষ্ট্র চরিত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্রকে ততোধিক গুরুত্ব না দিয়ে বরং নৈতিকতার আত্মোপলব্ধি এবং ত্যাগ আদর্শকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এক বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিক এখানে চিহ্নিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় নৈতিকতার মধ্যকার আদর্শ এখানে ফুটে উঠেছে। তবে প্রাচীন ভারতে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তা এখানে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দীপক কুমার নাগ এক্ষেত্রে রামায়ণের আরণ্য কান্ড, ৩৩ সর্গ কে চিহ্নিত করে লিখেছেন যে, ''....কিন্তু যিনি সাবধানী, ধার্মিক, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় এবং রাজ্যের কোনও কিছুই যাঁর অজানা থাকে না, তাঁর পতন হয় না। যে রাজা ঘুমের মধ্যেও নীতিগত বিষয় সজাগ থাকার চেষ্টা করেন, যাঁর রাগ ও খুশির ফল সবাই দেখতে পায়, কখনও তাঁর অনাদর হয় না।" সুতরাং একটা আদর্শ রাষ্ট্র, শাসক ও ব্যবস্থার বিষয়সমূহ আমরা রামায়ণে পাই।

১.৭ মহাভারতের রাজনীতি :

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে অবগত হতে হলে বেদব্যাসকৃত মহাভারতের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য। বিভিন্ন পণ্ডিতেরা মনে করেন মহাভারত বহুবার সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় প্রশ্নাবলী যেভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে মনে হয় এটি মনুস্মৃতি রচনার সময়েরও অনেক আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেরও আগে রচিত হয়েছিল। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে পান্ডু পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আলাপচারিতা শান্তিপর্বের যে দুটি অধ্যায়ে আছে তা ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্রে বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান রেখেছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম রাজার কর্তব্য সম্পর্কে শান্তিপর্বে 'রাজধর্ম' শীর্ষক প্রথমভাগে এবং আপৎকালীন রাজার কর্তব্য সম্পর্কে দ্বিতীয়ভাগ 'আপদধর্মে' যে সকল উপদেশাবলী প্রদান করেছিলেন তা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার গভীরতা, মৌলিকত্ব ও বিশিষ্টতাকে সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উদ্ভব, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাজা ও মন্ত্রীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, কর স্থাপনের নীতিসমূহ, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি ও তার সমস্যাবলী, যুদ্ধ ও শান্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শান্তি পর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এবং পরিমার্জিত ও উন্নততর রূপ লাভ করেছে। শুধুমাত্র শান্তিপর্ব নয় আরও কয়েকটি পর্বে রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মহাভারতে আছে। যেমন সভা পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আছে। আদিপর্বের ১৪২তম অধ্যায়ে কূট ও কৌশলী

রাজনীতিকে সমর্থন করা হয়েছে। সভাপর্বের ৩২৩তম অধ্যায়ে এবং বন পর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে গভীর কৌতূহলদ্দীপক আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীতে মহাভারতের মতো এত ব্যাপক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনাসহ আর কোনও বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই মহাকাব্যকে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, লোককাহিনী, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বকোষ বলে উল্লেখ্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রকৃত মহাভারতের রচয়িতা কে তা নিয়ে বিতর্ক আছে এবং গ্রন্থটিতে যুগে যুগে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন আখ্যান বা উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এমনকি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। তবে কাশীরাম দাসের অনুদিত মহাভারত বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান করে নিয়েছে। তবে আদি মহাভারতের রাষ্ট্র শাসন ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট সুস্পষ্টভাবে রাজ ধর্মের আলোতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। উল্লেখ্য যে মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে নতুন নতুন বক্তব্য যেমন আছে ঠিক তেমনি বহু কথার পুনরাবৃত্তিও আছে। তাছাড়া অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের ও সন্ধান মেলে। যা ধর্ম রাজনীতির পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে।

আসলে রামায়ণ ও মহাভারতে রাজনীতি শাস্ত্র, নৈতিকতা সম্পর্কিত যে ভাবনাগুলো উঠে এসেছে তা নিয়ে গবেষকগণ তাঁদের মতন করে বিষয়টিকে দেখার এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন এবং এই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে রাজধর্ম, নৈতিকতা সম্পর্কিত অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হল রাজনৈতিক ধারাভাষ্যকার গণের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ এর মধ্যকার ব্যবধান।

এক কথায় বলা যায় যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি ও নীতিশাস্ত্রের চর্চা সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং বহু শতাব্দী বিস্তৃত। বিভিন্ন মত ও গোষ্ঠীর বহু পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা ভাবনা, রচনা, আলোচনা, গবেষণা, ব্যাখ্যা, টিকা ও ভাষ্য এক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

১.৮ মধ্যযুগের ধর্ম-রাজনীতি : নৈতিকতার প্রেক্ষিতে

প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের ভারতে উত্তরণের কালে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বে অ-ভারতীয়দের অংশগ্রহণ এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ওতপ্রোতভাবে সংযুক্তিকরণের পটভূমিকায় ভারতীয় ধর্ম-রাজনীতি চরিত্র বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তন সেই সময়কার সমাজ ও নৈতিকতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে, সাহিত্যের ধারা প্রবাহের দিকে চোখ রাখলে রমা মুখোপাধ্যায়-এর অনুবাদে এইচ. আর. ঘোষাল এর ভারতীয় জনগণের ইতিহাসের রূপরেখা গ্রন্থের মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ, ''এই যুগের অধিকাংশ সময়েই রাজসভায় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে দুটি সমান্তরাল পথে, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ পথে। ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য কৃতির মধ্যে কবিতা ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত। সুফি সাধক আমির খুসরো ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক। তবে রাজদরবারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ছিলেন মিনহাই-উস-সিরাজ এবং বরণী। তুর্কি ভাষায় বাবরের স্মৃতি গ্রন্থটির যথেষ্ট সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। বাহমনী সুলতান এবং বিজাপুরের আদিল শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় উর্দু সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। কয়েকজন উর্দু কবি ছিলেন প্রতিভাধর। এই সময়ের ধর্মীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় অতীন্দ্রিয় মতবাদের অনেক গ্রন্থ। বহু মিষ্টিক সাধকের অন্যতম ছিলেন আমীর খুসরোর গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়া। এদের সংলাপ মিষ্টিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।'' মধ্যযুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্ম রাজনীতির এই যে প্রবণতা তাকে মূলত সুলতানি ও মুঘল শাসনকালের নিরিখে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে শুক্রনীতিসারে যেভাবে বংশানুক্রমিক রাজার কথা বলা আছে ঠিক তেমনি মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ও তাই ছিল এবং মনে করা হত রাজার বিশেষ কিছু ঐশ্বরিক গুণ আছে যার মধ্য দিয়ে তিনি ধর্ম রক্ষা করবেন এবং এইভাবে ধর্মীয় পরিসরকে রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রবণতা আমরা মধ্যযুগে দেখতে পাই। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার কিছু উপাদান এখানেও উপস্থিত

ছিল। বিশেষ করে নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে অমীমাংসিত বিরোধের সমাধান, এই যুগেও হয়নি তাই ধর্ম রাজনীতির চর্চায় ধর্ম কেন্দ্রিক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সমান্তরাল অবস্থান আমরা লক্ষ্য করি।

১.৯ মূল্যায়ণ :

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল ধর্মরাষ্ট্র, অর্থাৎ ধর্ম ছিল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। তবে এক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়টিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হত না। অর্থাৎ ধর্ম বলতে কোনও সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মমতকে বোঝাত না বরং ধর্ম ছিল এক জীবন চর্চা যা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে গ্রথিত করে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অগ্রগতি সাধন করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। এই ধরনের উদার ভাবনা চিন্তার স্বরূপ থাকার কারণে তা রাষ্ট্র ও রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে ধর্ম নিহিত নৈতিকতার দ্বিবিধ অবস্থান ও ব্যাখ্যা এবং সেই সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিরোধ এখনও ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আলোকে চর্চিত হয়ে চলেছে।

১.১০ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) ধর্মীয় রাজনীতি সংজ্ঞা দিন।

খ) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

গ) প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় রাজনীতির বিষয় বস্তু সমূহ লিখুন।

ঘ) ধর্মীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার উভয় সংকট ও অমীমাংসিত বিরোধ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

ঙ) মহাকাব্যের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্ম ও নৈতিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

চ) মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতার অমীমাংসিত বিরোধ ও টানাপোড়েন সম্পর্কে লিখুন।

১.১১ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Appadorai, A. (2002). *Political Thoughts in India (400 BC-1980).* New Delhi: Khama.

ii. Sircar, D. C. (Ed.). (1972). *Early Indian Political and Administrative System.* Kolkata: University of Calcutta.

iii. Varma, V. P. (1986). *Ancient and Medieval Indian Political Thought.* Agra : Lakshmi Narain Agarwal.

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-2

ভারতীয় বিভিন্ন রাজপদের রাজনীতি
Politics of Reigning/Kingship

বিষয়সূচি :

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-রাজনীতি
২.৪ মধ্যযুগীয় রাজপদের প্রকৃতি ও বৈধতা
২.৫ সুলতানী আমল
২.৬ মুঘল আমল
২.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
২.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটি ভারতের বিভিন্ন সময়কালের রাজপদের রাজনীতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের উত্থান নিয়ে আলোচনা করেছে। সেই বিভিন্ন সময়কালগুলি হল—প্রাচীন আমল, মধ্যযুগীয় ভারত, সুলতানি আমল ও মুঘল আমল।

২.২ ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির আলোচনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু কিভাবে, কখন প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের আবির্ভার ঘটল সে বিষয়ে সদোত্তর পাওয়া সহজ নয়। কারণ রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিষয়টি সাধারণভাবেই অতিমাত্রায় তমসাছন্ন। প্রাচীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অধিকতর জটিল প্রকৃতির। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার অভাব হেতু এই বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর ধর্ম বা ঈশ্বর তত্ত্বের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। স্বভাবতই আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, সমকালীন ভারতীয় রাষ্ট্র প্রকৃতিগত বিচারে ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল। প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম প্রসার ভিত্তিতে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতই সমকালীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার প্রাণকেন্দ্রে ধর্মের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা-চেতনায় ধর্ম ও দর্শনের উজ্জ্বল অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। ভারতীয় দর্শন হল প্রধানত ধর্মভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক ভারতীয় দর্শনেরই অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা। এই কারণে অনেকের অভিমত অনুসারে দর্শন, ধর্ম ও অধিবিদ্যার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা অঙ্গাঙ্গিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রাচীনকালে ভারতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র চিন্তা এবং সুসংবদ্ধ রাজনীতি বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি। এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের মতানুসারে প্রাচীন ভারতে ধর্মই ছিল রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এবং রাষ্ট্র ছিল ধর্মরাষ্ট্র। প্রাচীনকালে

ভারতে ও রাজার সঙ্গে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আবার উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাতের ঘটনাও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যসমূহ পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের ভাষ্য অনুসারে যে রাজা তাঁর পুরোহিতকে সম্যক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন, তিনি সহজেই তাঁর প্রজা সাধারণের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারেন এবং শত্রুপক্ষ সমূহকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে পারেন। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। সমকালীন রাষ্ট্র যে আইনকে বলবৎ করত তা উৎস ও প্রকৃতিগত বিচারে ধর্মীয় বলে বিবেচিত হত। প্রাচীন ভারতে রাজার আধ্যাত্মিক রক্ষাকর্তা হিসাবে পুরোহিতের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পুরোহিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে রাজার রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করতেন। পুরোহিত ছিলেন রাজার অন্যতম মুখ্য মন্ত্রণাদাতা। বৈদিক যুগ থেকেই এই ধারা পরিলক্ষিত হয়। শুক্রনীতিসারের ভাষ্য অনুসারে রাজার মন্ত্রীমন্ডলীর প্রথম ব্যক্তিই হলেন পুরোহিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বক্তব্য অনুযায়ী নৃপতির সাহায্যকারী মোট উনিশটি শ্রেণীর মধ্যে পুরোহিত ও মন্ত্রীরা হলেন প্রধান দুটি শ্রেণী।

উপরিউক্ত পুরোহিততান্ত্রিক প্রবণতা আনুমানিক এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণ আমলের অবসানের আগে পর্যন্ত পুরোহিত সম্প্রদায় রাজার উপর এবং রাজার মাধমে সমগ্র রাষ্ট্রের উপর তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার উদ্যোগ-আয়োজনকে অব্যাহত রেখেছিল। তবে সমকালীন ভারতের সকল রাজাই এই পুরোহিততান্ত্রিক প্রবণতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না। অনেক রাজাই এই প্রবণতাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যথাসম্ভব উদ্যোগী হয়েছেন। এ বিষয়ে অথর্ববেদে আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বা রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মধ্যে এই বিরোধ বা সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যেও এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ বর্তমান। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এরকম কোনও ঘটনার তথ্যের সমৃদ্ধ প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। যাই হোক কালক্রমে এই বিবাদের অবসান ঘটে উভয় তরফের ইতিবাচক উদ্যোগে। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষই পারস্পারিক ও স্ব স্ব স্বার্থ বিরোধের আপসমূলক মীমাংসায় উপনীত হয়। উভয় পক্ষই অনুধাবন করতে পারে যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হতে পারে। তদনুসারে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পরস্পর পরস্পরের উপর সীমাবদ্ধ দেবত্ব আরোপ করে।

২.৩ প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-রাজনীতি

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হল অর্থশাস্ত্র ঐতিহ্য। অর্থশাস্ত্রকে ভারতীয় দার্শনিক-সাহিত্যিকেরা বলেন উপবেদ, লৌকিক জীবনের বেদ। ভারতীয় জীবনের কাম্য চতুবর্গ হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। প্রতিটি বর্গের লক্ষ্য সাধনের পেছনে কাজ করে এক একটি শাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের সব দিকই ঘোষিত—তবে সব কিছুর পেছনেই আছে ধর্মের বিধান। এখানে রাজনীতির কথা এসেছে। ধর্মশাস্ত্রে রাজনীতি হল রাজধর্ম, রাজার শাসক হিসাবে দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার। মনুস্মৃতির 'রাজধর্ম' অধ্যায়টি রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসনের নীতি বা পরিকল্পনারই প্রকাশ। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-রাজনীতি সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রে অনেক কথাই আছে, তবে রাজনীতি বা রাষ্ট্র শাসনের বিদ্যা এখানে স্বাধীনভাবে বা তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি। ধর্ম যে অর্থে ব্যক্তিগত বা সমাজ জীবনের ভিত্তি হতে পেরেছে, সেই অর্থে রাষ্ট্র জীবনের ভিত্তি হতে পারেনি বলেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

ভি. আর. ভান্ডারকার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করে বলেছেন যে এই গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হবার পর আর বলা যাবে না যে রাষ্ট্রতত্ত্বে হিন্দুমনের কোনও আগ্রহ নেই এবং ভারতীয়রা রাজনীতিকে কখনও জ্ঞানের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করেনি। কৌটিল্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র শাসনের ভিত্তি হিসাবে ধর্ম বা নীতি নয়, গুরুত্ব আরোপ করেছেন উপযোগিতা, সুবিধা ও পন্থা বা নীতির উপর। রাজনীতি সম্পর্কে কৌটিল্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হল একজন বাস্তব রাজনীতিজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি,

আদর্শবাদী বা উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। ধর্ম বা সত্যের আদর্শ নয়, বরং কৌটিল্যের তত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তব রাজনীতিবোধ। রাষ্ট্র বা রাজ্যের পক্ষে কী নীতি প্রযোজ্য, কোন কৌশল বা পন্থা সুবিধাজনক, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা পরিচালনার স্বার্থে কোন্ প্রশাসনিক ও আর্থিক নীতি উপযুক্ত একথা ভেবেই কৌটিল্য তাঁর রাষ্ট্র তত্ত্বের অবতারনা করেছেন। নিজস্ব চিন্তা বা মতামত প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থশাস্ত্র ঐতিহ্যের প্রজ্ঞা শিক্ষকদের ও তাঁদের মতামতকে স্মরণ করেছেন তিনি। প্রচলিত সমাজ বিন্যাস (বর্ণ, বেদ ও আশ্রম নির্ভর) এবং বিদ্যমান রাজতান্ত্রিক শাসনের পক্ষেই ওকালতি করেছেন তিনি তাঁর প্রখর রাজনৈতিকবোধ ও বুদ্ধি দিয়ে। কৌটিল্য রাষ্ট্র বা রাজনীতিকে তার চিন্তার প্রধান আশ্রয় করলেও, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্রের মূল প্রশ্ন নিয়েও উপেক্ষা করেন। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে বর্ণ ব্যবস্থা, আশ্রম ধর্ম, বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে কৌটিল্যের ধারণায়। কৃষি, অর্থনীতি, রাজস্ব ব্যবস্থা, হিসাব, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা কৌটিল্যের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। দর্শন ও তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কেও কৌটিল্যের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনের মধ্যে কৌটিল্য সব জ্ঞানের আলো, বিশ্ব ও মানব মনের বিকাশের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। রাজনীতির সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও দর্শনের যোগ কোথায় এটাও কৌটিল্য বিচার করেছেন।

কৌটিল্যের মতে রাজার সবচেয়ে বড়ো গুণ ও শক্তি হল উপযুক্ত দণ্ড প্রণয়ন। তাঁর লক্ষ্য হবে দন্ড যেন সুবিবেচনা প্রসূত হয়। দন্ডাশক্তি দ্বারা রক্ষিত রাজাই প্রভাবশালী হন। রাজার আদর্শ বৃত্তি হল তাঁকে ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য) দমন করতে হবে। বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে। কর্তব্যের অনুশাসন দ্বারা প্রজাদের স্বধর্মে স্থাপন করতে হবে, লোকপ্রিয় হতে হবে।

তবে কৌটিল্যের কাছে, রাজার আদর্শ বা নীতি শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেনি। রাষ্ট্রের স্বার্থে, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাজাকে কঠোর হতে হবে, নৈতিকতা বর্জন করে, লোক-লৌকিকতার স্বার্থ ত্যাগ করে রাজনীতির কূটকৌশল ও হীন পন্থাও অবলম্বন করতে হবে একথা তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন। কৌটিল্যের বিবেচনায় রাজা ভালো মানুষ হতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত মহৎ গুণাবলী ত্যাগ করতে হতে পারে। কৌটিল্য রাজাকে কপট হতে বলেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে সর্তক হতে প্রয়োজনীয় ছলনা ও চাতুরি গ্রহণ করার কথা বলেছেন, বিশ্বাসঘাতক হতে বলেছেন, গুপ্তচর নিয়োগ করে প্ররোচনা, বিভেদ সৃষ্টি করতে বলেছেন।

কোটিল্যকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও গুপ্তচরবৃত্তির উদ্ভাবক হিসাবেই দেখলে চলে না। তিনি ছিলেন কূটনীতি ও বিদেশনীতির প্রধান প্রবক্তা। বিদেশনীতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি ছিল অসাধারণ। তাঁর উদ্ভাবিত কূটচক্র (Diplomatic circle or Mandala), চারটি নীতি (Upaya), ছয়টি গুণ (Sadgunya) বিদেশনীতি ও কূটনীতির পাঠকের চোখে রাজনীতির এক অনবহ্য ভাষ্য। রাজা কিভাবে এইসব নীতি ও গুণগুলিকে ব্যবহার করে অভীষ্ট ফল লাভ করবেন, বিজিগীষু হবেন সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। তিনি শক্তি বা সিদ্ধির কথাও বলেছেন যা রাজাকে আপনার কর্মে শক্তি বা সিদ্ধি অর্জনে সাহায্য করবে। কৌটিল্য বিশ্বাস করেছেন যে সুবিবেচনার সাহায্যে তাঁর চারটি উপায় ও দুটি গুণকে ব্যবহার করতে পারবেন যে রাজা তিনিই হবেন বিশ্বজয়ী।

বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে আর্যপূর্ব ও আর্য সমাজের রাষ্ট্র রাজনীতির চিত্র পাওয়া যায়। মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য, নীতিসার ইত্যাদির সূত্রের বৈদিক পূর্ববর্তী যুগের প্রাচীন ভারতীয় সমাজের রাষ্ট্র ও শাসনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র শাসনের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদ, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মগধের অভ্যুত্থান, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের সময়কালের মগধের মৌর্য শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র শাসক হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের কৃতিত্ব, শুঙ্গ শাসন, সাতবাহন বংশের শাসন, কুষাণ রাজাদের শাসন, গুপ্ত সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা এবং হর্ষবধর্নের রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা।

পুরাণ, জৈন ভগবতী সূত্র, বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজন পদের কথা। যোলটি রাজ্যে বিভক্ত উত্তর ভারতের এই রাজ্যগুলি ছিল কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধী, বৃজি, মল্ল,

চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, সুরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ। এই রাজ্যগুলির মধ্যে দুটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে পরিচিত ছিল কোশল ও মগধ। কোশল রাজ্যের শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ এবং বিম্বিসার ছিলেন মগধ রাজ্যের রাজা। মগধ ছিল সে যুগের সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মগধের হর্যা বংশের বিম্বিসার, অজাতশত্রু ইত্যাদির চেষ্টায় মগধ এই সময় একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। বিম্বিসারের আমলে মগধের ক্ষমতা বিস্তার, সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনীতির সূত্রপাত হয়। নন্দ বংশের শেষ সম্রাট ধননন্দ অবশ্য মগধের এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারেননি। তাঁর সময়েই কূটনীতি, সামরিক ও প্রশাসন নীতির অন্যতম প্রবক্তা, রাজনীতি শাস্ত্রের নব ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা চাণক্যের আবির্ভাব। চাণক্য তাঁর প্রতি রাজার অবমাননার প্রতিশোধ নিতে ধননন্দের বিরুদ্ধে প্রজা অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে এবং নন্দ বংশের উচ্ছেদ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে মগধের সিংহাসনে বসলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এক অনন্য ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছিল। মৌর্য শাসনের সূচনা ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চন্দ্রগুপ্তের আমলে রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রসার, ধর্মের চেয়েও রাজকীয় কর্তৃত্বের গুরুত্ব বেশি, তবে ধর্মপালন ও বর্গ ব্যবস্থা রক্ষা রাজার কর্তব্য। মৌর্য শাসন ব্যবস্থা একটি নতুন গতি লাভ করে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। প্রথম দশ বছর অশোকের রাজত্বকালে রাজনৈতিক ঐতিহাসিকদের বিচারে ক্ষমতার লালসা ও উন্মত্ততার এক কলঙ্কিত অধ্যায়। কলিঙ্গ জয়ের পর্ব সম্ভবত: মৌর্য রাজত্বের শেষ বিজয়াভিযান। এর পরই অশোকের রূপান্তরের পর্যায়, প্রায়শ্চিত্তের শুরু। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী, কেন্দ্রিভূত, সামরিক আমলাতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে অশোক ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা করলেন মানবিক, গণতান্ত্রিক শাসনের এক সুমহান ঐতিহ্য। যুদ্ধযাত্রার পরিবর্তে শুরু হল ধর্মযাত্রা, হিংসা ও হানাহানির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ। রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহৃত হল প্রজা কল্যাণে, দেশ গঠনে ও সমাজ সেবার কাজে। অশোকের রাজত্বকালে রাষ্ট্রের চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। উন্মত্ত রাজা অশোকের রূপান্তর ঘটলো প্রজাপালক পিতায়। মগধের পরক্রান্ত রাজা হলেন বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষকদের শরণাগত। আদর্শ রাজার কর্তব্যকে স্মরণ করেছেন অশোক।

প্রাচীন ভারতের বাস্তব রাজনৈতিক চিত্র পেতে গেলে অশোক পরবর্তী সময়ে সাতবাহন, কুষাণ ও গুপ্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচয় তুলে ধরা আবশ্যিক। ড. আর. এস. শর্মা দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজ্যের সঙ্গে উত্তর ভারতের মৌর্য ব্যবস্থার বেশ কিছু মিল লক্ষ্য করেছেন। কুষাণ রাজ্য প্রাচীন ভারতে বিদেশী প্রভাব ও উপাদান প্রতিষ্ঠার দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। গুপ্ত সাম্রাজ্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সার্বিক বিকাশের দিক থেকে প্রকৃত অর্থেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সুবর্ণ যুগ। সাতবাহন রাজ্যের প্রথম রাজা সিমুক বা এই রাজ্যের জনপ্রিয় শাসক সাতকনী এখানে রাজ্য শাসনের যে ধারা প্রতিষ্ঠা করেন তা কোনও বংশানুক্রমিক ধারা নয়, এক অর্থে রাজআমাত্যদের শাসন। আমাত্যরাই ছিলেন শাসক, রাজার প্রধান মন্ত্রণাদাতা, কোষাধ্যক্ষ এবং কৃষি প্রশাসন ব্যবস্থার মুখ্য আধিকারিক।

মৌর্য শাসনের পতনের পর প্রায় দুশো বছর ভারতে যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে সেই অবস্থা থেকে ভারতভূমি রক্ষা করার ক্ষেত্রে কুষাণ রাজত্বের অবদান এদেশের রাজনৈতিক ঐতিহাসিকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। রাজকীয় উপাধির প্রবর্তন করে সমাজ ও শাসনের উপর রাজার আধিপত্য অন্তত তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে একাধারে জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এক মিশ্র প্রকাশ। এই যুগে রাজা ছিলেন শাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে। আর্থিক, বাণিজ্যিক, সামরিক নীতি সম্পূর্ণভাবেই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সাহায্য নিয়েই তাঁকে প্রশাসন পরিচালনা করতে হত। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র শাসনের শেষ উল্লেখযোগ্য নজির হল থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্য শাসন। ভারতবর্ষের মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের ধারাকেই তিনি বজায় রেখেছিলেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের নজির তিনিও স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময় ও রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য ক্ষমতার অপব্যবহার ছিল তাঁর কাছে বড়ো অপরাধ। অন্যদিকে তাঁর আমলে নাগরিক পরিষেবার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত লক্ষ্য

করা যায়।

প্রাচীন ভারতে যে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্র শাসনের নানা প্রথা ও পদ্ধতির কালক্রমে একটা সুবিন্যাস্ত রূপ লক্ষ্য করা গেছে।

২.৪ মধ্যযুগীয় রাজপদের প্রকৃতি ও বৈধতা :

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস হল মুসলমান শাসকদের ইতিহাস। মুসলমান শাসকরা রাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসাবে সুবিদিত। স্বভাবতই ভারতের মধ্যযুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল রাজতান্ত্রিক। তবে মধ্যযুগের সব মুসলমান শাসকরা রাজতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈধতা সম্পর্কে সমমতালম্বী ছিলেন এমন নয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শাসক রাজপদটিকে মহিমামন্ডিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে আন্তরিক ছিলেন। রাজতন্ত্রকে সবাই সমভাবে ব্যবহার করেননি। রাজতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈধতা সমকালীন শাসকদের স্ব স্ব ধ্যান-ধারণা ছিল। এঁদের অনেকেই তাদের কাজকর্ম ও আত্মজীবনীর মাধ্যমে রাজতন্ত্র সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত করেছেন।

২.৫ সুলতানী আমল :

ভারতে মধ্যযুগে সুলতানী আমলে রাজপদে নির্বাচনের ব্যাপার সুনির্দিষ্ট কোনও আইনি ব্যবস্থা বা রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয় না। সুলতানী আমলে অধিকাংশ শাসক বংশের শাসনকালের সময়সীমা ছিল স্বল্পকালীন দুই-তিন প্রজন্মের মধ্যেই অধিকাংশ সাম্রাজ্যের মেয়াদ সীমাবদ্ধ ছিল। আবার এই স্বল্পকালীন সময়েও বিভিন্ন বিদ্রোহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দমনে মুসলমান শাসকদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। এ প্রসঙ্গে গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজী, মুহম্মদ বিন তুঘলক প্রমুখ শাসকদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামরিক শক্তির জোরে সুলতানরা সিংহাসনে আসীন হতেন। সামরিক শক্তি ছাড়াও সুলতানের সার্বিক ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার উপর রাজত্বের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। মধ্যযুগের মুসলমান শাসকরা নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হিসাবে আখ্যায়িত করতেন। এই সমস্ত মুসলমান শাসকের ঘোষণা অনুসারে তাঁদের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল চরম, চূড়ান্ত এবং অখন্ড- অহস্তান্তরযোগ্য। সমগ্র জাতিকে তাঁরা অভিন্ন সার্বভৌম শাসকের অধীনে ঐক্য সাধনের মতবাদ খাড়া করতেন। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান রাজারা জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। ভারতে মধ্যযুগে মুসলিম শাসনাধীনে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার সূত্রপাত ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমান রাজারা ইসলাম ধর্মের সৌভ্রাতৃত্ব ও সহর্মামর্তার আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। মুসলমান শাসকরা নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং প্রজা সাধারণের প্রশ্নাতীত আনুগত্য অর্জনের জন্য এই পথেই এগিয়েছিলেন। রাজপদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য এবং রাজকীয় যাবতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মুসলিম শাসকরা 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি', 'ঈশ্বরের ছায়া', 'খলিফা', প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালের মুসলমান সম্রাটরা নিজেদের 'খলিফা' হিসাবে ঘোষণা করতেন।

গিয়াসুদ্দিন বলবন (1266-1287 খ্রীষ্টাব্দ) 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অনেক সময় বলবন নিজেকে খলিফার ডানহাত হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন। এই সমস্ত উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল রাজপদের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। মুখল সম্রাটরা রাজপদের উপর দেবত্ব আরোপের ব্যাপারে বিশেষ জোর দিতেন। তাঁদের মতানুসারে রাজা হলেন মানুষের পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি। বলবন রাজতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য হিসাবে রাজার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই কারণে তিনি, প্রজার কাছ থেকে তো বটেই, এমনকি আমীর-ওমরাহদের সাথেও সাধ্যমত দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। সুলতানরা খলিফার নামে 'মুৎবা' পাঠ করতেন এবং মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করতেন।

এ বিষয়ে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সময়কার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে মুদ্রা থেকে খলিফার নাম মুছে দিয়েছিলেন।

এক সময় তিনি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহজনিত রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে পতিত হন। তাঁর ধারণা জন্মায় যে খলিফার অদৃশ্য অনুমোদন ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দুর্যোগ অতিক্রম করা অসম্ভব। এ রকম প্রত্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজত্বের শেষের দিকে মুদ্রায় খলিফার নাম আবার উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার মিল্লাত এর কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ-বিন-তুঘলক মিশর থেকে খলিফার এক বংশধরের অনুমোদনসূচক স্বীকৃতিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। উল্লেখ যে 'মিল্লাত' হল ইসলাম ধর্মীয় জনতার সৌভ্রাতৃত্ব।

আলাউদ্দিন খলজী (1296-1316 খ্রীষ্টাব্দ) রাজপদ সম্পর্কিত ঐশ্বরিক মতবাদের চরম পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইসলামের প্রতি আলাউদ্দিনের আস্থা ছিল অপরিসীম। নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান। সম্রাট হিসাবে আলাউদ্দিন দাবি করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লার প্রতিনিধি। তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের নির্দেশ লঙ্ঘন করা। নিজেকে তিনি সর্বশক্তিমান এবং প্রজা সাধারণকে সেবক হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি সম্রাটের স্বৈরী ক্ষমতা বিশ্বাসী ছিলেন। প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি ইসলামের আইনকে অনায়াসে উপেক্ষা করতেন। সম্রাট হিসাবে নিজেকে তিনি আইনি বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে বলে বিবেচনা করতেন। আলাউদ্দিনের আমলে তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। রাজতন্ত্রের বৈধতা সম্পাদনের জন্য খলিফার অনুমোদনকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করেননি তিনি।

২.৬ মুঘল আমল :

মুঘল আমলেও রাজপদের বৈধতা সম্পর্কিত ঐশ্বরিক মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অব্যাহত ছিল। আকবরের মতানুসারে তাঁদের পরিবার ছিল সূর্য বংশজাত। আকবরের পূর্বপুরুষদের ধারণা অনুযায়ী তাঁরা ছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বংশধর এবং রাজপদ সমালোচনার উর্ধ্বে। মুঘল সম্রাট আকবরের জীবনীকার আবুল ফজল রাজপদের ঈশ্বরীয় প্রকৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী রাজা হলেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজার মধ্যেই ঈশ্বরের মহিমা বর্তমান। রাজার মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে। তাঁর মতানুসারে রাজপদ ঈশ্বরের দান হিসাবে পাওয়া যায়। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল রাজপদের প্রাপ্তি ঘটে। জনগণ কাউকে রাজা করতে পারে না। রাজার রাজপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনসাধারণের কোনও ভূমিকা নেই। স্বভাবতই প্রজা সাধারণ রাজপদের বৈধতা প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন তুলতে পারে না। রাজা সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে। মুঘল আমলে রাজপদের বৈধতার বিষয়টি ঈশ্বরীয় মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রবল সামরিক শক্তি রাজপদের বৈধতাকে সুদৃঢ় করেছিল।

চেঙ্গিস নিজেকে ঈশ্বরীয় আদেশপ্রাপ্ত চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি মনে করতেন যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি দায়বদ্ধ। তৈমুরের মধ্যেও সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কিত অভিন্ন ধারনা বর্তমান ছিল। পরবর্তীকালে অভিন্ন বংশধারার অনুসারী প্রত্যেক পুরুষ সদস্য সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে পরিগণিত হয়। এরকম অবস্থায় যৌথ সার্বভৌমত্বের ধারণার উদ্ভব হয়। পারিবারিক পর্যদের সকলে যৌথভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। আবার কেন্দ্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা করায়ত্ত করার ব্যাপারে বংশধরদের মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিবাদ-বিসংবাদের আশঙ্কা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তৈমুরের বংশধর বাবর কাবুলের শাসক হিসেবে 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি রাজতন্ত্র বিষয়ক তৈমুরের ধারণার পরিবর্তন করেন। বাবর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতো এবং অন্যান্য উত্তর পুরুষদের মতো 'মির্জা' উপাধি গ্রহণ করেননি। রাজতন্ত্র সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার পুনরায় পরিবর্তন করেন বাবরের পুত্র হুমায়ুন। তিনি যৌথ সার্বভৌমকতার ধারণাকে বাতিল করেন এবং এককভাবে সার্বভৌম সম্রাট সম্পর্কিত ধারণা তুলে ধরেন। আকবর পিতা হুমায়ুনের মতোই যৌথ সার্বভৌমত্বের ধারণাকে স্বীকার বা সমর্থন করেননি। তিনি মুঘল সম্রাটের একক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে নিজেকে প্রধান ইমাম বলে ঘোষণা করেন।

শরিয়তি আইন ব্যাখ্যা এবং আইন প্রণয়নের অধিকার তিনি উলেমাদের হাত থেকে নিজের হাতে নেন। আকবরের আমলে রাজতন্ত্র সম্পর্কে এক নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। আকবরের এই রাজতন্ত্র হল 'স্বলুক-ই-কুল', এর অর্থ সকলের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সাধারণ শান্তি। সম্রাট আকবরের রাজতন্ত্র ছিল মুসলিম রাজবংশের শাসন। কিন্তু এই রাজতন্ত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের অবাধ আনুগত্য অর্জন করে। সম্রাট আকবরের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র সামরিক শক্তি নির্ভর ছিল না।

আকবরের পর সম্রাট হন তাঁরই মনোনীত জাহাঙ্গীর। মুঘল রাজবংশের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকে। রাজতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈধতা সম্পর্কে বাদশাহ জাহাঙ্গীর অল্পবিস্তর অভিন্ন মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন। জাহাঙ্গীর জীবনাবসানের পর রাজতন্ত্র সম্পর্কিত প্রচলিত ধারায় কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এর পরে সিংহাসনে বসেন শাহজাহান। তিনি ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র। হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তিনি দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। শাহজাহানের জীবিতাবস্থাতেই সিংহাসন নিয়ে পুত্র সন্তানদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয় এবং ঔরঙ্গজেব দিল্লির মসনদে আসীন হন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে ঔরঙ্গজেব ছিলেন সর্বাধিক বিতর্কিত বাদশা। গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসক হিসাবে তিনি পরিচিত। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও চূড়ান্তকরণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

তবে প্রকৃতপক্ষে মুঘল রাজতন্ত্রের প্রশাসনের কেন্দ্রে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট। তবে জনস্বার্থ সংরক্ষণই ছিল সম্রাটের অন্যতম লক্ষ্য। মুঘল বাদশারা আইন প্রণয়ন শাসনকার্য পরিচালনা ও বিচারকার্য সম্পাদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সীমাহীন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও মুঘল বাদশার অভিপ্রয় অনুসারে মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিতেন। আবার সম্রাটের সম্মতিক্রমেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতেন।

২.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী :

ক) প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-রাজনীতি ব্যাখ্যা করুন।

খ) সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে রাজপদের প্রকৃতি কেমন ছিল?

২.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী :

i. Gonda, Jan. (1956). Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View. *Numen, 3* (1).

C.C : 1.3

Unit-3

Politics of Rituals : Yajna through the Ages

Contents :

3.1 Objectives

3.2 Introduction

3.3 Durkheim's views on Religion

3.4 Politics and Rituals

3.5 Definition of *yajna*

3.5.1 Rajasuya

3.5.2 Ashvamedha

3.6 Critical Reception

3.7 Right to Perform Yajna by Unmarried Women

3.8 Performance of Yajna by Women for Good Progeny and Importance of Anushthana

3.9 Gandhian Concept on Yajna or Sacrifice

3.10 Conclusion

3.11 Self-Assessment Questions

3.12 Suggested Readings

3.1 Objectives

A reading of this module will enable the students to understand the relationship between politics and ritual. This module aims to discuss the said relationship both theoretically and practically. Nonetheless, this module will also discuss the question of women in performing yajna and Gandhi's thought on yajna.

3.2 Introduction

Modern democracies function on the principle of separation of religion and state, necessitated by the historical tensions between church and state in Europe and power struggles in feudal societies between rulers and priests in medieval India. Also, spiritually enlightened individuals have preferred to keep away from popular politics, though there are examples in history of enlightened rulers who

wielded power for the greater, common good. Janaka, the Ramayana-era ruler of Mithila, Mauryan emperor Ashoka and Mughal emperor Akbar stand out as examples of rulers who were seekers themselves.

Before delving deep into the module let us first have a theoretical understanding between politics and ritual. While politics belongs to the domain of the state and power, ritual belongs to the domain of culture.The first thing to note is that "cultural politics" does not signify two separate categories: it is not culture separated from politics. The term *cultural politics* refers to the way that culture—including people's attitudes, opinions, beliefs and perspectives, as well as the media and arts—*shapes* society and political opinion, and gives rise to social, economic and legal realities. In this regard ritual has been and will continue to be an essential part of political life.Rituals often finds its social base in religion.

3.3 Durkheim's views on Religion

Émile Durkheim (1858-1917) placed himself in the positivist tradition, meaning that he thought of his study of society as dispassionate and scientific. He was deeply interested in the problem of what held complex modern societies together. Religion, he argued, was an expression of social cohesion.

In the field work that led to his famous *Elementary Forms of Religious Life*, Durkheim, a secular Frenchman, looked at anthropological data of Indigenous Australians. His underlying interest was to understand the basic forms of religious life for all societies. In Elementary Forms, Durkheim argues that the totems the Aborigines venerate are actually expressions of their own conceptions of society itself. This is true not only for the Aborigines, he argues, but for all societies.

Religion, for Durkheim, is not "imaginary", although he does deprive it of what many believers find essential. Religion is very real; it is an expression of society itself, and indeed, there is no society that does not have religion. We perceive as individuals a force greater than ourselves, which is our social life, and give that perception a supernatural face. We then express ourselves religiously in groups, which for Durkheim makes the symbolic power greater. Religion is an expression of our collective consciousness, which is the fusion of all of our individual consciousnesses, which then creates a reality of its own.

It follows, then, that fewer complex societies, such as the Australian Aborigines, have less complex religious systems, involving totems associated with particular clans. The more complex a particular society, the more complex the religious system is. As societies come in contact with other societies, there is a tendency for religious systems to emphasize universalism to a greater and greater extent. However, as the division of labour makes the individual seem more important (a subject that Durkheim treats extensively in his famous *The Division of Labour in Society*), religious systems increasingly focus on individual salvation and conscience.

Durkheim's definition of religion, from Elementary Forms, is as follows: "A religion is a unified system of beliefs and practices related to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden

– beliefs and practices which unite into one single moral community called a Church, all those who adhere to them." This is a functional definition of religion, meaning that it explains what religion does in social life: essentially, it unites societies. Durkheim defined religion as a clear distinction between the sacred and the profane and in effect this can be paralleled with the distinction between God and humans.

This definition also does not stipulate what exactly may be considered sacred. Thus later sociologists of religion (notably Robert Neelly Bellah) have extended Durkheimian insights to talk about notions of civil religion, or the religion of a state. American civil religion, for example, might be said to have its own set of sacred "things": the flag of the United States, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., etc. Other sociologists have taken Durkheim's concept of what religion is in the direction of the religion of professional sports, the military, or of rock music.

3.4 Politics and Rituals

Political traditions, on the one hand, accumulate and remain in some forms of meaningful social and political experience of the nation that forms a constitutive basis of political culture, and on the other hand it is the mechanism of transmission, reproduction and further development of experience. From a content point of view, the political tradition is comprised of stable images of political reality and power, embodied in symbols, myths and stereotypes, as well as value-normative guidance of political consciousness and political behaviour of the samples, which are stored and played during the social and political transformations. They are the result of the development of society and reflect the historically developed social and political experience, which is passed from generation to generation.

Ritual is a practical implementation of the symbolic content of political traditions as a special model of political action. The ritual is a standardized set of cultural and symbolic content action undertaken in situations prescribed traditions. The coronation of the monarch, the inauguration of the president, parades, participating in social activities are the examples of political rituals. They are an important manifestation of political involvement orrather dissatisfaction. Thus, mass ceremony accompanying the rise to power of a new leader – is a means of strengthening the legitimacy in terms of the involvementof the masses in politics, when the population of the state symbolically share the glory and power of the leader.

3.5 Definition of Yajna

Yajna or Yagya or Yagna literally means "sacrifice, devotion, worship, offering", and refers in Hinduism to any ritual done in front of a sacred fire, often with mantras. Yajna has been a Vedic tradition, described in a layer of Vedic literature called Brahmanas, as well as Yajurveda. The tradition has evolved from offering oblations and libations into sacred fire to symbolic offerings in the presence of sacred fire (Agni).

Yajna rituals-related texts have been called the Karma-kanda (ritual works) portion of the Vedic literature, in contrast to Jnana-kanda (knowledge) portion contained in the Vedic Upanishads. The proper completion of Yajna-like rituals was the focus of Mimansa school of Hindu philosophy. Yajna have continued to play a central role in a Hindu's rites of passage, such as weddings. Modern major Hindu temple ceremonies, Hindu community celebrations, or monastic initiations may also include Vedic Yajna rites, or alternatively be based on Agamic rituals. In the upcoming sections we will exclusively focus on two types of yajnas.

3.5.1 Rajasuya

Rajasuya (Imperial Sacrifice or the king's inauguration sacrifice) is a Œrauta ritual of the Vedic religion. The Rajasuya associated with the consecration of a king is prescribed as a means to establish a king's sovereignty. It is described in the Taittiriya corpus, including ApastambaSrauta Sutra 18.8–25.22. It involves soma pressing, a chariot drive, the king shooting arrows from his bow, and a brief "cattle raid". There is a telling of the tale of Shunahshepa, a boy who was nearly sacrificed to Varuna on behalf of the sonless king Harishchandra. Also included is a game of throwing dice by which the king is enthroned and the cosmos is regenerated.

3.5.2 Ashvamedha

The Ashvamedha is a horse sacrifice ritual followed by the Œrauta tradition of Vedic religion. It was used by ancient Indian kings to prove their imperial sovereignty: a horse accompanied by the king's warriors would be released to wander for a period of one year. In the territory traversed by the horse, any rival could dispute the king's authority by challenging the warriors accompanying it. After one year, if no enemy had managed to kill or capture the horse, the animal would be guided back to the king's capital. It would be then sacrificed, and the king would be declared as an undisputed sovereign.

The best-known text describing the sacrifice is the Ashvamedhika Parva or the "Book of Horse Sacrifice," the fourteenth of eighteen books of the Indian epic poem Mahabharata. Krishna and Vyasa advise King Yudhishthira to perform the sacrifice, which is described at great length. The book traditionally comprises 2 sections and 96 chapters. The critical edition has one sub-book and 92 chapters.

The ritual is recorded as being held by many ancient rulers, but apparently only by two in the last thousand years. The most recent ritual was in 1741, the second one held by Maharajah Jai Singh II of Jaipur. The original Vedic religion had evidently included many animal sacrifices, as had the various folk religions of India. Brahminical Hinduism had evolved opposing animal sacrifices, which have not been the norm in most forms of Hinduism for many centuries. The great prestige and political role of the Ashvamedha perhaps kept it alive for longer.

3.6 Critical Reception

The earliest recorded criticism of the ritual comes from the Cârvâka, an atheistic school of Indian philosophy that assumed various forms of philosophical skepticism and religious indifference. According to some writers, ashvamedha is a forbidden rite for Kaliyuga, the current age. This part of the ritual offended the Dalit reformer and framer of the Indian constitution B. R. Ambedkar and is frequently mentioned in his writings as an example of the perceived degradation of Brahmanical culture. While others such as Manohar L. Varadpande, praised the ritual as "social occasions of great magnitude". Rick F. Talbott writes that "Mircea Eliade treated the Ashvamedha as a rite having a cosmogonic structure which both regenerated the entire cosmos and re-established every social order during its performance."

3.7 Right to Perform Yajna by Unmarried Women

Maharishi Manu who regarded Vedas as of axiomatic authority was a great advocate of higher education for women and for performance of religious rites (including yajna) by them. Further, the view of orthodoxy that women are not allowed to perform Yajna alone is fallacious. It is pertinent to point out here that unmarried female students (brahmacharinis seeking knowledge) who pursued education in the Gurukuls during Vedic times like their male counterparts were compulsorily required to perform Yajna (after wearing in Yajyopavitam-holy thread) as a part of their daily routine. Atharvaveda in Brahmacharya Sukta (11.5.18) says 'Brahmacharyenakanyayuvanamvidantepatim'charyoBrahmacharenbrahmacharnimichatey', i.e, a girl after having completed her studies and after having fulfilled her pledge of celibacy finds a youth as a suitable match for her. Today also you can find a large number of women students studying in unorthodox Gurukuls especially run by Arya Samaj where they not only perform Yajna themselves but also act as a Brahma of the Yajna leading the ritual. (Rig Veda 8.33.19 says Istri hi Brahma babhuvith). However, it is unfortunate that amongst certain sections even in this age women are not allowed to recite Gayatri Mantra and they are denied holy threads and the study of Vedas.

3.8 Performance of Yajna by Women for Good Progeny and Importance of Anushthana

Religious education including performance of Agnihotra and other rituals was a part of women's day to day life. Rigveda calls upon women to learn this all – Yajyamdadheysaraswati (Rig 1/3/11). There are certain rituals which are conducted with a wife – 'Patnivantonamasyamnamasayan' (Rig Veda 1/72/5) The Shatapatha Brahman calls her "YosaVaiSaraswati" and invites wise women for Yajna (1/5/9). Even for getting a good progeny the importance of Yajna was realised and Anushthana is prescribed by Shatpatha Brahmana. (1/9/2/1-35) Basically, Yajna (a sacrifice) is a spiritual activity and a divine resolve. The spirit of Yajna lies in performing good deeds and in surrendering to God whatever

a person has. It is a step towards reaching the higher levels of Yoga. According to Sri Krishna Life is to be treated as a Yajna or a sacrifice and in Gita (3-9), he tells Arjuna, to perform his duty without any attachment and in the spirit of Yajna (sacrifice).

3.9 Gandhian Concept on Yajna or Sacrifice

Yajna means an act directed to the welfare of others, done without desiring any return for it, whether of a temporal or spiritual nature. 'Act' here must be taken in its widest sense, and includes thoughts and word, as well as deed. 'Others' embraces not only humanity, but all life. Therefore, and also from the standpoint of ahimsa, it is not a yajna to sacrifice lower animals even with a view to the service of humanity. It does not matter, that animal sacrifice is alleged to find a place in the Vedas. It is enough for us, that such sacrifice cannot stand the fundamental tests of Truth and Non-violence. I readily admit my incompetence in Vedic scholarship. But the incompetence, so far as this subject is concerned, does not worry me, because even if the practice of animal sacrifice be proved to have been a feature of Vedic society, it can form no precedent for a votary of ahimsa.

Again a primary sacrifice must be an act, which conducts the most to the welfare of the greatest number in the widest area, and which can be performed by the largest number of men and women with the least trouble. It will not therefore, be a yajna, much less a mahayajna, to wish or to do ill to anyone else, even in order to serve a so-called higher interest. And the Gita teaches, and experience testifies, that all action that cannot come under the category of yajna promotes bondage.

The world cannot subsist for a single moment without yajna in this sense, and therefore the Gita, after having dealt with true wisdom in the second chapter, takes up in the third the means of attaining it, and declares in so many words, that yajna came with the Creation itself. This body therefore has been given us, only in order that we may serve all Creation with it. And therefore, says the Gita, he who eats without offering yajna eats stolen food. Every single act of one who would lead a life of purity should be in the nature of yajna. Yajna having come to us with our birth, we are debtors all our lives, and thus forever bound to serve the universe. Even as a bond slave receives food, clothing and so on from the master whom he serves, so should we gratefully accept such gifts as may be assigned to us by the Lord of the universe. What we receive must be called a gift; for as debtors we are entitled to no consideration for the discharge of our obligations. Therefore, we may not blame the Master, if we fail to get it. Our body is His to be cherished or cast away according to His will. This is not a matter for complaint or even pity; on the contrary, it is a natural and even a pleasant and desirable state, if only we realize our proper place in God's Scheme. We do indeed need strong faith, if we would experience this supreme bliss. "Do not worry in the least about yourself, leave all worry to God," - this appears to be the commandment in all religions.

This need not frighten anyone. He who devotes himself to service with a clear conscience will day by day grasp the necessity for it in greater measure, and will continually grow richer in faith. The path

of service can hardly be trodden by one, who is not prepared to renounce self-interest, and to recognize the conditions of his birth. Consciously or unconsciously every one of us does render some service or other. If we cultivate the habit of doing this service deliberately, our desire for service will steadily grow stronger, and will make not only for our own happiness but that of the world at large.

3.10 Conclusion

It is an irony of our times that we want modern medicines to pass several stages of tests and layers of trials before accepting them, but have unwavering faith in many ancient rituals and remedies just because they have been mentioned in our sacred texts.

Consider our belief in a variety of *yajnas* mentioned in the Vedic literature. Our texts are full of claims that several powerful kings were blessed with more power, territory and wealth, and their queens with children after performing a horse sacrifice (*AshwamedhaYajna*) — an elaborate ritual that also involved the chief wife's cohabitation with a slain stallion.

The horse sacrifice is now rarely performed, but many other Vedic rituals are still popular. Several people perform *Mahamrityunjaya Yajna* to beat illness and seek long lives for themselves and family members, believing that fumes from herbs used in the ritual have healing powers. During times of drought, *yajnas* propitiating the rain god Indra are common sight in many north Indian states.

And then there are prayers and rituals that are supposed to silence enemies and sort out problems. Rajasthan chief minister VasundharaRaje, for example, regularly visits a shrine in Datia, where she locks herself up for several days to pursue prayer and sacred rituals.

But, do these rituals actually work? Did the *AshwamedhaYajna* actually make queens more fertile? Can *yajnas* cure illness, slay enemies or generate dark clouds and force them to pour down on parched land?

If the recommendations of a panel formed by the Central government are implemented, we may soon find out. The Second Sanskrit Commission, a 13-member panel set up by the UPA-II for suggesting measures for promoting our ancient culture and reviving Sanskrit, has recommended that scientific labs be set up to test the efficacy and power of Vedic rituals.

According to *The Indian Express*, the panel has made several other recommendations, including a four-language formula for school education, making Sanskrit compulsory for students from classes VI to X.

It is a misconception that making Sanskrit mandatory can make it popular. Until a few years ago, it was part of every school curriculum, including convent schools in north India. But, it disappeared from classrooms because students didn't find it of any practical use: It was neither spoken in public, nor was it part of popular culture. Cramming it like parrots did not guarantee future employment either, unless a student's ambition was limited to teaching Sanskrit or becoming a priest in temples, or at weddings and funerals.

While the efficacy of the new set of ideas for reviving Sanskrit without finding too many practical uses for it can be put up for academic scrutiny, it is the proposal for subjecting our ancient wisdom to scientific tests that should be welcome. It is an excellent suggestion for separating myths from facts, superstition from scientific logic and blind faith from verifiable formulas.

The biggest problem with much of our ancient wisdom and rituals is that it has never been subjected to rigorous scientific scrutiny. Much of what passes off as Vedic knowledge is either mythology — we had *PushpakVimans*, our ancestors were capable of plastic surgery, queens could summon gods with mantras for conceiving — or is too fantastic to believe — just reciting mantras can prolong life or *gaumutra* has rare healing qualities.

The incredulity inspired by such untested (even laughable) claims gets magnified because of our blind faith in hokum like astrology, palmistry and *vaastushastra* that is often presented to the world as wisdom bequeathed by our ancestors.

But, there may indeed be a lot in our texts that can be of great benefit to humanity. The real challenge is to separate it from the unscientific, illogical and far-fetched ideas that masquerade as Vedic practices and knowledge.

3.11 Self-assessment questions

a) Discuss Durkheim's views on Religion.

b) Write a note on the Gandhian Concept on Yajna or Sacrifice.

c) Write a brief note on AshvamedhaYajna.

3.12 Suggested Readings

i. Durkheim, Emile. (1915). *The Elementary Forms of the Religious Life.* (J. W. Swain, Trans.) New York: Macmillan.

ii. *The Mahabharata.* (1905). (M. N. Dutt, Trans.) Calcutta: Elysium Press.

iii. Gandhi, Mohandas Karamchand. (1932). *From Yeravda Mandir.* (V. G. Desai, Trans.) Ahmedabad: Navajivan Mudranalaya.

iv. Lukes, Steven. (1975). Political Ritual and Social Integration. *Sociology , 9* (2), 289-308.

v. Patton, Laurie. (2005). *The Hindu World.* (G. T. Sushil Mittal, Ed.) Routledge.

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-4

রাজনীতির দিক থেকে দণ্ড ও দণ্ডনীতি : শাস্তির আলোচনা থেকে প্রতিরোধের আলোচনা (Politics of Danda : From a Narrative of Punishment to a Narrative of Resistance)

বিষয়সূচি :

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ মনুস্মৃতিতে দণ্ডনীতি

৪.৪ মহাভারতের দণ্ডনীতি

৪.৫ শুক্রনীতিতে দণ্ডনীতি

৪.৬ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত দণ্ডনীতি

৪.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৪.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থাপঞ্জী

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককে একটি দর্শন এবং রাষ্ট্রের কৌশল হিসেবে দণ্ডনীতি আলোচিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মনুস্মৃতি-র, মহাভারতের, শুক্রনীতিসারের এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দণ্ডনীতি-র ব্যাখ্যাকে তুলে ধরা হয়েছে।

৪.২ ভূমিকা

প্রাচীন ভারতবর্ষে দণ্ডনীতি নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে আমরা উল্লেখ পাই; অবশ্য কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'-এর বিশদ বিবরণ অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কৌটিল্যের দণ্ড ও দণ্ডনীতি নিয়ে আলোচনা পূর্বে সংক্ষেপে দণ্ড ও দণ্ডনীতির অর্থ এবং অন্য ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এর আলোচনা কাম্য।

দণ্ড ও দণ্ডনীতি শব্দদ্বয় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে ধর্ম শব্দটির সঙ্গে যে বহুবিধ অর্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তা সম্ভবত দণ্ডনীতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। তবে সালেটর (Saletor) মন্তব্য করেছেন যে এই ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকলে 'দণ্ডনীতি' শব্দটি ধর্মশাস্ত্রের মতো উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্র-র মতোই একই মর্যাদার (Status) অধিকারী।

এ. এস. আলটেকার (A. S. Altekar) উল্লেখ করেছেন যে সমাজ বিরোধী উপকরণের উপস্থিতির জন্য দণ্ড বা শক্তি প্রয়োগ সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রয়োগের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেন। জনগণ একে প্রায় প্রয়োজনীয় বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং একে একটি ধর্মীয় জীবনের প্রকাশ হিসাবে জনগণ মেনে নেয় যা মানবতার বিধির দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে। এই বিধি/আইন (Code) জনগণ এবং রাজা উভয়ের ক্ষেত্রেই একইভাবে প্রযোজ্য। এইভাবে এ. এস আলটেকার (A. S. Altekar) বিশ্লেষণ করেছেন যে, দণ্ডনীতি সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকটি সামগ্রিকভাবে বিবেচিত হয় এবং তারা যে যথার্থভাবে সংগঠিত এবং একে অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা প্রকাশিত হয়।

বেণীপ্রসাদ যদিও দণ্ডকে রাষ্ট্রের একটি উপকরণ হিসাবে গণ্য করেছেন তথাপি 'দণ্ড' শব্দটির নিজস্ব অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অর্থ হিসাবে স্বীকৃতি রয়েছে। বেণীপ্রসাদ বলেছেন শব্দগত অর্থে দণ্ডনীতি হল দমনের বিজ্ঞান (Science of coercion)। সামগ্রিকভাবে দেখলে 'দণ্ড' কে সরকারের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যায়। হিন্দু সমাজ চিন্তার সাধারণভাবে স্বীকৃতি ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দণ্ডকে আধিপত্যকারী উপকরণ হিসাবে একটি কলা (art) হিসাবে গণ্য করা হয়।

এ. এল. বেশাম (A. L. Besham) দণ্ডনীতিকে বলপ্রয়োগের এবং প্রশাসনিক কৌশল হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে 'দণ্ড' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল 'লাঠি' (Stick) যা থেকে এর দ্বিতীয় অর্থ বিভিন্ন পটভূমিতে প্রকাশিত হয় যেমন নিপীড়ন (Coercion), শাস্তি (Punishment), অর্থদণ্ড (fine) বা সহজভাবে 'ন্যায়' (justice)। মানুষের প্রকৃতি ছিল ধূর্ত (evil) এবং দুর্নীতিমূলক (corrupt)। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আইন ও নৈতিকতা সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয় লেখক এই বিশ্বাস পোষণ করেছেন যে মানবজাতি পবিত্র আইন (Sacred law) কেবলমাত্র মেনে চলত শাস্তির ভয়ে।

জি. পি. সিং (G. P. Singh) দণ্ডনীতির বর্ণনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ও লক্ষ্য সম্পর্কে একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ''সমাজের সকল সদস্যদের প্রতি সমান ন্যায় নীতি, শাস্তি, জনগণের সমৃদ্ধি রাষ্ট্রের কল্যাণ, দক্ষ প্রশাসন, দুর্বল শ্রেণীদের অধিক শক্তিশালীদের হাত থেকে রক্ষা এবং সর্বশেষে প্রত্যেককে ধর্মের সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখার জন্য দণ্ডনীতি তৈরি করা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞার পটভূমিতে বলা যেতে পারে যে দণ্ডনীতি হল সরকারের প্রশাসনের সেই নীতি যা শাস্তি (Punishment), বলপ্রয়োগ (Force) এবং ন্যায়নীতি (Justice) সম্পর্কে আলোচনা করবে।

৪.৩ মনুস্মৃতিতে দণ্ডনীতি

দণ্ডনীতির ক্ষেত্রে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

(i) দণ্ডের ভয়ে নিশ্চয় এবং সচল সবাই আনন্দ অর্জনের সুযোগ পায়, এবং আইনের পথ থেকে সরে আসে না।

(ii) শাসক ফৌজদারি কাজকর্মকে স্থান কাল দক্ষতা এবং শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিচার করে এবং সেই অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করে।

(iii) একই দণ্ড রাজা, পুরুষ (Purusha), নেতা, প্রশাসক এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রা অর্থাৎ চার আশ্রমের জন্য প্রযোজ্য।

(iv) এটি দণ্ড যা নাগরিকদের শাসন করে, তাদের সংরক্ষণ করে। প্রত্যেকে যখন ঘুমায় তখন দণ্ড জাগরূক থাকে। জ্ঞানী দণ্ডকে ধর্মের মতোই দেখেন।

(v) যদি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনার পর দণ্ড প্রদান করা হয় তাহলে নাগরিকদের সুখী করা যাবে এবং অন্যায়ভাবে যদি দণ্ড প্রয়োগ করা হয় তাহলে সর্বক্ষেত্রেই তা ধ্বংসাত্মকভাবে দেখা যাবে।

(vi) যদি শাসক সর্তক না হয়ে তার শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে তাহলে যারা বেশি শক্তিশালী তারা দুর্বলদের ক্ষতি করবে যেমন বড় মাছ ছোটদের খায়।

(vii) গুণী ব্যক্তিদের সংখ্যা দুর্লভ। সমাজের সবশিষ্ঠরা শাস্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমস্ত প্রাণীরা শাস্তির ভয়েই সেই পথ অনুসরণ করে যা তারা কেবলমাত্র পাওয়ার যোগ্য।

(viii) যদি দণ্ড বিচার সম্মত না হয় (Unjudicious) তাহলে সমস্ত ৪টি বর্ণের লোকেরাই দুর্নীতির শিকার হতে পারে। সামাজিক সুষ্ঠু আচরণ যা সংযোগসেতুর বা আচরণের (decorum) কাজ করে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং এইভাবে অরাজকতা (anarchy) সৃষ্টি হতে পারে।

(ix) দণ্ড হল সবচেয়ে কার্যকরি যন্ত্র (tool) যার দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিরা যারা ক্ষমতায় আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদি শাসক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে একই দণ্ড নিজেদের এবং সমগোষ্ঠীদের ধ্বংস করতে পারে এবং এর ফলে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা দেখা দেবে।

৪.৪ মহাভারতে দণ্ডনীতি

(i) মহাভারতে ব্রহ্মাকে (Brahma) দণ্ডনীতির প্রধান রচয়িতা বলে গণ্য করা হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে আইনের প্রয়োগ না থাকার ফলে সম্পূর্ণ নৈরাজ্য দেখা দেয়। কিন্তু তার আগে জনগণ শান্তি ও সুখে জীবনবাসন করত। বলা হয়েছে যে জনগণ একে অপরকে ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী সংরক্ষণ করত যদিও তখন কোনও রাষ্ট্র বা কোনও শাসক ছিল না। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার প্রয়োগ ছিল অস্থায়ী। জনগণ একে অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে সচেষ্ট হয়। শান্তিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মোহ (attachment) এবং ক্রোধ (Wrath) হল প্রধান উপকরণ যা রাষ্ট্রের প্রকৃতির সবক্ষয় ঘটায়। নৈতিকতার আইনের অবসান ঘটার ফলে জনগণের কোনও ধারণা ছিল না কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়। এমনকি দেবতাদের অস্তিত্বও বিষণ্ণ হয় এবং তারা ব্রহ্মাকে আবেদন জানান যাতে সমাজে আইনশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত হয়।

দেবতাদের অনুরোধের ফলে ব্রহ্মা আইন ও শৃঙ্খলা শুধুই প্রতিষ্ঠিত করেননি, উপরন্তু শাস্তির বিজ্ঞান বিবিধও গড়ে তোলেন। মহাভারতের ১২ অধ্যায়ে দণ্ডনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনটি উপকরণ যথা গুণ (Virtue) লাভ (Profit) এবং আনন্দ (Pleasure) প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মা এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছেন।

(ii) সংশোধনার্থে শাস্তি দেওয়ার (Chastisement) বিধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দণ্ডবিধি বিজ্ঞান জগৎকে সংরক্ষণ করবে। পুরষ্কার এবং শান্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে কার্যকরি হবে।

(iii) যেহেতু মানুষেরা শাস্তি দেওয়া বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় অথবা এই শাস্তি সূচক বিধি (Chastisement) সব কিছুই নির্দেশ দেয় বা পরিচালিত করে, তাই এই বিজ্ঞান তিনটি গুণের দ্বারা দণ্ডনীতি বা শাস্তিমূলক বিজ্ঞান বলে গণ্য হবে।

(iv) যদি সংশোধনার্থ শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, লোহার দণ্ড (rod) তৈরি করার জন্য পৃথিবীতে রাজা না থাকে, তাহলে বলবানরা দুর্বলের উপর শোষণ ও অত্যাচার করবে যেমন বড় মাছেরা ছোট মাছের উপর জলে করে থাকে (মাৎসান্যর)

(v) প্রাচীনকালের দিনগুলিতে যখন নৈরাজ্য (anarchy) ধ্বংসলীলার দ্বারা পরিচালিত হয় তখন বলবানরা একে অপরকে ধ্বংস করে, শক্তিশালী মাছেরা যেমন দুর্বল মাছদের ধ্বংস করে।

(vi) যখন শাসক দুবলদের কঠোর শাস্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা ধার্মিক তাদের পুরষ্কার দেয়, তখন সেই শাসক যমের (Yama) বা ন্যায়ের দেবতার ভূমিকা গ্রহণ করে।

(vii) চিরন্তন ব্যবসা অনুযায়ী (Eternal provision) যেখানে শাস্তির বিধি রয়েছে সেই বিধান সকলের ক্ষেত্রে এবং গুরুর (Preceyrtor) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যখন তিনি দুর্বিনীত হন এবং অপমানজনক কাজ করেন। কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তাও স্থির করা হয়।

৪.৫ শুক্রনীতিতে দণ্ডনীতি

শুক্র তাঁর নীতিসার (Nitisara) গ্রন্থে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দণ্ডর অর্থ, বিষয়বস্তু প্রকৃতি এবং তার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

(i) দণ্ড মন্দ আচরণ থেকে ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং যারা বাধ্য নয় বা অবাধ্য তাদের দমন করে, তাই 'দণ্ড' হল একটি উপকরণ যা জনগণের ক্ষেত্রে ভীতির সঞ্চার করে।

(ii) এই 'দণ্ড' উপকরণটি শাসকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারণ তিনি হলেন সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। নাগরিকেরা দণ্ডের ভয়ে তাদের কর্তব্য পালন করে। তাই ধর্মকে রক্ষার জন্য রাজার দণ্ডকে ব্যবহার করা উচিত।

(iii) আইনের উপর নির্ভরশীল দণ্ডকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে শাসক তার আকাঙ্খিত লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে সচেষ্ট হয় কারণ 'দণ্ড' হল ধর্মের প্রধান সংরক্ষক।

(iv) গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরা সেই শাসককে ত্যাগ করে যিনি যাদের শাস্তি পাওয়া উচিত তাদের শাস্তি দেয় না। আবার গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সেই শাসককে পরিত্যাগ করতে সচেষ্ট হন যিনি অপরাধীকে তার যথার্থ শাস্তির চেয়ে অধিক শাস্তি দেয় ও নিপীড়ন করে। ওই শাসক তাঁর পতনের সম্মুখীন হন যিনি অন্যায়ভাবে আইনের ব্যবহার করেন।

(v) নাগরিকেরা তাদের নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে একটি স্থিতিশীল শাসক প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাই কোনও শাস্তির ভয়ের জন্য রাজার শিক্ষাদান বা নিয়মাবলীকে নাগরিকগণ মেনে চলেন, তারা অবশ্যই নিয়মাবলীর রক্ষক শাসককে অনুসরণ করবে।

(vi) প্রতিটি মানুষ রাজার প্রদত্ত শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে নিজ কর্তব্য বা স্বধর্ম পালন করতে অভ্যস্ত হয়।

(vii) যখন ক্ষতিয়াদি বা আসামী জাগতিক সাক্ষ্যাদি (Earthly evidence) পেশ করে এবং অন্যরা ঐশ্বরিক চিন্তাধারায় আশ্রয় নেয় সেক্ষেত্রে শাসক সর্বদাই বাস্তব জাগতিক সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে বিচার বিভাগীয় কর্তব্য পালন করবে এবং কখনই ঐশ্বরীয় বর্ণনাকে গ্রহণ করবে না।

(viii) রাজা বা তারা অফিসারগণ কখনই নিজেরা এমন বিবাদ বা বিতর্ক সৃষ্টি করবেন না যাতে তাদের নিজ লোভের স্বার্থের বা রাগের কারণে সাধারণ নাগরিকগণ দমন নীতির শিকার হয়। ফরিয়াদী এবং বাদী উভয়কেই আদালতের সামনে হাজির না করে রাজা কখনই খেয়ালখুশি মত রায় দিতে পারেন না।

৪.৬ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বর্ণিত দণ্ডনীতি

ভারতীয় রাজনীতির উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে সুপ্রাচীনকালে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তিনি হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মুখ্যমন্ত্রী কৌটিল্য (যিনি বিষ্ণুগুপ্ত বা চানক্য নামেও পরিচিত) কৌটিল্য তাঁর রচিত 'অর্থশাস্ত্রে' প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্র কৌশল বিষয়ে যে অসামান্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন তার মধ্যে 'দণ্ডনীতি' অন্যতম। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে ৩০০ অবধি এই সময়কালের মধ্যে 'অর্থশাস্ত্র' রচিত হয় বলে ধারণা করা হয়।

মনুস্মৃতিতে ভারতের রাজনৈতিক আইনি চিন্তা ও কর্মের সূত্র হিসেবে তাৎপর্য রেখেছে ধর্মবোধ এবং নৈতিক শৃঙ্খলা, অর্থশাস্ত্রে ধর্মের প্রতি ভক্তি বা সত্যের প্রতি প্রবল আস্থা সত্ত্বেও ব্যবহারিক উপযোগ বা উপকারের ধারণাটিই রাজনীতির নির্ধারক ভিত্তিক বা প্রধান নীতি হিসেবে স্বীকৃতি রেখেছে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি বা রাজার প্রয়োজন কেন এ বিষয়ে প্রচলিত দৈবিক ব্যাখ্যা অনুসরণ না করে কৌটিল্য পেশ করেছেন রাষ্ট্র তথা রাজ্য শাসনের প্রয়োজন বা উপকারের একতত্ত্ব।

'অর্থশাস্ত্রে' সান্বীমিকী অর্থাৎ দর্শনের জিজ্ঞাসা বা সত্য বিচার পদ্ধতি, তিনবেদের ধর্মাধর্মের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে রাষ্ট্র শাসন তথা দণ্ডনীতির বিজ্ঞান। কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি এক অর্থে দণ্ডনীতির সকল কলা-কৌশল ও প্রয়োগের এক বিদ্যা।

কৌটিল্যের কথায় রাজদণ্ড অর্থাৎ রাজশক্তিই অন্য সব শাস্ত্রের গুণ ও অগ্রগতির সূত্র। দণ্ডনীতি হল শাস্তির আইন বা রাষ্ট্র পরিচালনার বিজ্ঞান। দেশের ভেতরকার অরাজক ও প্রতিকূল শক্তির চাপে দেশ যখন দগ্ধ, বুদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের প্রভাবে যখন হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্য দলিত ও আহত, বহিরাগত পারসিক ও হেলেনীয় যাযাবরের আক্রমণে যখন ভারতভূমি ও তার সংস্কৃতি বিপন্ন তখন কৌটিল্য এই সংকটাপন্ন বিপন্ন, ভেঙে পড়া ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিলেন।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে তাঁর দণ্ডনীতির ধারণাকে সামনে রেখেই প্রচার করেছেন এক ঐক্যবদ্ধ সংহত ভারত নির্মাণের কথা। কৌটিল্য তাঁর দণ্ডনীতিকে তিনটি অর্থে বিচার করেন—

১। রাজদণ্ড অর্থাৎ রাজা কেমন করে দণ্ডধারণ করে দেশকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে পারেন,

২। শাস্তি বিধানের নীতি ও পদ্ধতি—এক্ষেত্রে প্রধানত আর্থিক নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধ দমনের পন্থা ও কৌশলগুলি লক্ষ্যণীয়।

৩। সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস, পরিচালনা ও সফল প্রয়োগ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এক শক্তিশালী অঙ্গ হিসেবে দণ্ডের প্রতীক সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণতাদানের কথা ভেবেছেন কৌটিল্য।

(ক) রাজদণ্ড : দণ্ডধারী হিসেবে রাজার কর্তব্য কী এ প্রশ্ন বিচার করার আগে কৌটিল্য দণ্ডনীতির উদ্দেশ্যে সেকথা বলেছেন। কৌটিল্য বলেছেন দণ্ডনীতি হল অলব্ধ বস্তুকে লাভ করার উপায় ও লব্ধ বস্তুকে সুরক্ষিত করার পন্থা, সুরক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করার এবং যা বৃদ্ধি পায় তাকে সঠিকভাবে উপযুক্ত লোকের মধ্যে বণ্টন করার নীতি। দণ্ডনীতিই বিশ্বের অগ্রগতির পথ, মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সঠিক ও সুঠাম পথ। কৌটিল্য রাজদণ্ডের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন, রাজা যখন তার দন্ড নিয়ে মানুষকে পরিচালনা করবেন তখন চারবর্ণ ও চতুরাশ্রম ব্যবস্থা সুরক্ষিত হবে। দণ্ডই রাজাকে স্বধর্মে পরিচালিত করে। রাজার প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিষয়, শক্তি, সব কিছুই উৎস দণ্ড।

কৌটিল্যের তত্ত্বে দণ্ড কোন অলৌকিক শক্তি হিসেবে হাজির নয়, দণ্ডকে তিনি উপস্থিত করেছেন রাজার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির শক্তি হিসেবে। প্রজা শাসন ও কল্যাণের পন্থা হিসেবে। যে রাজকীয় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতাকে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার প্রতীক হল দণ্ড।

(খ) শাস্তির নীতি ও কৌশল : কৌটিল্যের মতে দণ্ডনীতি সূক্ষ্ম অর্থে শাস্তি বিধানের নীতি ও পদ্ধতি। প্রশাসনিক কাজকর্ম যাদের হাতে বণ্টন করা হবে তারা যাতে সেই কাজকর্ম সঠিকভাবে, নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেন দণ্ডধারী রাজাকে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি দেবার পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। যে সুগঠিত পরিষদের সাহায্যে রাজা তাঁর কাজকর্ম পরিচালনা করবেন সেই পরিষদের আলাদা আলোচনার গোপনীয়তা বজায় রাখতে রাজাকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। গোপনীয়তা ভঙ্গ করা কোনরকম বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য। রাষ্ট্রদূত, রাজস্ব আদায়কারী, হিসাবরক্ষক সরকারি তত্ত্বাবধায়ক, বনাঞ্চল সংরক্ষণ অস্তপাল, দুর্গপাল, সান্ধিধাতা (যিনি কোষ, দুর্গ, ব্যবসা, শস্যভান্ডার, দেবালয় অস্ত্রাগার ও

বন্দীশালা নির্মাণের তদারকী করেন), দৌবাবিক, প্রচেষ্টা ব্যবহারিক (নথিপত্র রক্ষক), বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান অধ্যক্ষ, পদাতিক বাহিনী, হস্তিবাহিনী অশ্ববাহিনী ও রথবাহিনীর প্রধান, প্রশাস্তা সমাহর্তা সকল কর্মচারীদেরই তাঁদের কৃতক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পুরষ্কার ও শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকবে বলে কৌটিল্য ঘোষণা করেছেন।

কোটিল্য বলেছেন ব্যবহার নির্ণয়ে রাজাই হলেন শ্রেষ্ঠ অধিকারী তবে বিচার বিষয়ে অর্থ নির্ণয়ের জন্য তিনি তিনজন ধর্মস্থের সহায়তা গ্রহণ করবেন। এঁরাও আবার ব্যবহার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পন্ডিতজনের উপদেশ নিয়ে বিচার কার্য সম্পাদন করবেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রে সংগ্রহণ সার্বধিক দ্রোণমুখ ও স্থানীয় অর্থাৎ দশটি গ্রাম দুইশত গ্রাম, চারশত গ্রাম এবং আটশত গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বিচারালয় সংগঠিত হবে। এখানেই অপরাধ বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।

কৌটিল্য রাজ কর্মচারীদের অন্যায়, অপরাধ সম্পর্কে রাজাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন। কৌটিল্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কোষ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ বিষয়ে। কোষ পূর্ব সবারম্ভা অর্থাৎ রাজাকে স্মরণে রাখতে হবে যে সব কাজই কোষের উপর নির্ভর করে। যাতে কোষ বৃদ্ধি হয়, কোষ ক্ষয় না ঘটে রাজা সেদিকে দৃষ্টি দেবেন।

সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারী কোষ বৃদ্ধির কারণ ঘটাবেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে বাণিজ্যের প্রসারে সাদৃশ্য করবেন। দুর্ভিক্ষের অনুপস্থিতি, কর ফাঁকি রোধ এবং নানাভাবে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটাবেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুবস্কার দানের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু যে কোন ধরনের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা গড়মিল, রাজস্ব ক্ষতি, রাজস্ব অপহরণ, অন্যায়ভাবে রাজস্ব উপভোগের বিরুদ্ধে থাকবে কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা। তহবিল তছরূপের বিরুদ্ধে কৌটিল্য কঠিন শাস্তির সুপারিশ করেছেন। তিনি চল্লিশ রকমের তহবিল তছরূপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

কৌটিল্যের বক্তব্য কোষ আত্মসাৎ বা গড়মিলের কাজে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে অপরাধের মাত্রা অনুসারে সাজা দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষ নিবন্ধক, প্রতিগ্রাহক, দায়ক, দ্বাপক, মন্ত্রীর কর্মচারী সকলেরই অপরাধ বিচার করা হবে। শুধু কোষের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীই নয়, কৌটিল্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত রাজকর্মচারীর পরীক্ষা করতে বলেছেন। সামর্থ ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিয়োগ, কর্মচারীর প্রতিদিনের কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য এবং ওই ব্যাপারে রাজাকে গুপ্তচরের সহায়তা নিতে বলেছেন। কার্য পরিদর্শকের উপর প্রতিটি বিভাগের কাজকর্ম, ভুলত্রুটি, অন্তর্ঘাত সম্পর্কে খোঁজ রাখার জন্য রাজাকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন কৌটিল্য।

দেওয়ানী ব্যবস্থাবিধি প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলেছেন যে বাদী ও প্রতিবাদীর অর্থাৎ অভিযোগ ও অভিযুক্তের আবেদন ও প্রত্যুত্তর বিচারের প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ করবেন; সাক্ষীদের সাক্ষ্য বচন শুনবেন এবং প্রয়োজনমত ধর্মশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্রের বিধি বা ব্যবহার বিধি, দেশাচার, লোকাচার নজির হিসেবে রাজা শাসন ও রাজাজ্ঞার পর্যালোচনা করে বিচারকেরা দণ্ড প্রণয়ন ও অর্থ নির্ণয় করবেন।

দেওয়ানি অপরাধের জন্য দণ্ডমানের যে সব পদ্ধতির কথা কৌটিল্য বলেছেন তার মধ্যে প্রধান হল জরিমানা। এই জরিমানাকেও আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যে কোন অপরাধের জন্য সাধারণ বা মৃদু জরিমানা হল ৪৮-৯৬ পণ (সাধারণত রৌপ্যমুদ্রা)। মাঝারি দণ্ডের ক্ষেত্রে জরিমানা হল ২০০-৫০০ পণ। চরম দণ্ডের ক্ষেত্রে জরিমানা হল ৫০০-১০০০ পণ। যে ক্ষতিকর কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তার ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণ অবশ্যই বেশি। তবে যারা কুকর্মের সহচর তাদের ক্ষেত্রেও নূন্যতম মৃদু জরিমানা ধার্য হয়েছে। এছাড়া যারা কুকর্মের সঙ্গে লিপ্ত নয় অথচ এই কাজ দেখেছে বা শুনেছে কিন্তু প্রকাশ করে নি তাদের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ অপরাধীর জরিমানার অর্ধেক ধার্য হয়েছে। দেওয়নি বিধি ভঙ্গের জন্য শুধু জরিমানাই নয়, জরিমানার সঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ডের ও সুপারিশ করেছেন কৌটিল্য। বাদী, প্রতিবাদী সাক্ষী প্রত্যেকের সামান্য ভুল ভ্রান্তিতে জরিমানা যোগ্য অপরাধ।

সঠিক দণ্ডদানই হল ন্যায় দণ্ড এবং কৌটিল্যের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ন্যায় বিচারের দ্বারা প্রজাকে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম। ন্যায় বিচার যদি রাজাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন না করতে পারে তবে সে ন্যায় বিচারের কোন মূল্য নেই। কৌটিল্য আইনের চারটি

অঙ্গের কথা বলেছেন ধর্ম, ব্যবহার, ইতিহাস এবং রাজাজ্ঞা। এই চারটি অঙ্গ স্থির করে আইন কিভাবে কোন পথে চলবে। এক্ষেত্রে প্রথম অঙ্গটির তুলনায় পরেরটি কৌটিল্যের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। ধর্ম বলতে কৌটিল্য বুঝেছেন নিত্য সত্য, যার বিশ্বের উপর প্রবল প্রভাব আছে। ব্যবহার হল সাক্ষ্য প্রমাণ, ইতিহাস জনগণের ঐতিহ্য মেনে স্থির হয়। আর রাজাজ্ঞা হল রাজার ন্যায়দণ্ড। এই ন্যায়দণ্ডের স্থানই সবার উপরে। রাজা যদি ধর্ম, ব্যবহার ইতিহাস এবং ন্যায় মেনে বিচার করেন তবে তিনি সমস্ত বিশ্ব জয় করতে পারবেন।

অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় অধিকরণে দেওয়ানি মামলা মোকদ্দমার কথা বলা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের চতুর্থ অধিকরণে কৌটিল্য সরাসরি ন্যায় বিচারের প্রশ্নে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের (কন্টকশোধন) প্রশ্ন নিয়ে ভেবেছেন। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় অংশের সাথে চতুর্থ অংশের (অধিকরণের) পার্থক্য হল প্রথম ক্ষেত্রে প্রধানত সাধারণ দেওয়ানি মামলা ও বিচার প্রসঙ্গ গুরুত্ব রেখেছে। এক্ষেত্রে রাজকীয় অমাত্যদের সাহায্যেই এবং আইনি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরামর্শ মেনেই বিচারকার্য সম্পাদন হবে। ফৌজদারি মামলায় রাজার নেতৃত্বে প্রশাসনিক আদালত কিভাবে সমাজে কণ্টক শোধন করবেন তার উপায় নির্ধারিত হয়েছে। সব রকমের হাকিম মামলা মোকদ্দমা ও গুরুত্বর অপরাধের শাস্তি কথা এই প্রসঙ্গে এসেছে। কণ্টক শোধন বলতে কৌটিল্য যা বুঝেছেন তা হল দেশের শান্তির ও সমৃদ্ধির পথে যে সব কাঁটা বা বাধা আছে তার অপসারণ। তিনজন কমিশনার (প্রদেষ্টা) ও তিনজন মন্ত্রী নিয়ে রাজার নেতৃত্বে গঠিত সংস্থা কণ্টক শোধনের বিষয় নির্ধারণ করবেন।

ফৌজদারি দণ্ডবিধির মধ্যে আছে (১) কারিগর, তন্তুরা, ধোপা, স্বর্ণকার, মেথর, চিকিৎসক, গায়ক ও বাদ্যকারের রাষ্ট্র বিরোধী বা প্রজাবিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্কতা, (২) প্রবঞ্চক বণিকদের হাত থেকে প্রজার রক্ষা (৩) অগ্নি, প্লাবন, মড়ক, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মুষিক, হিংস্র জন্তু ও প্রেতাত্মার বিপদ বা উপদ্রব থেকে রক্ষা, (৪) গুপ্তচরদের অনিষ্ঠ থেকে প্রজার রক্ষা, (৫) অসৎ জীবনধারন থেকে প্রজাকে প্রতিরোধ, (৬) যুবকদের ফৌজদারি অপরাধ দমনের ব্যবস্থা, (৭) সন্দেহজনক গতিবিধি, চোরাই দ্রব্য গ্রহণ ও রক্ষণ সংযত বিষয়ে নজরদারী প্রভৃতি, (৮) আসন্ন মৃত্যু বা হঠাৎ মৃত্যুজনিত পরিস্থিতি, (৯) প্রশাসনের নানা স্তরের কর্মচারীদের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা, (১০) অপরিণত বলিকার সঙ্গে যৌন সংযম রোধ, (১১) ন্যায় ও ধর্মবিরোধী অন্যান্য অসৎ কাজকর্মের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

কৌটিল্য ব্রাহ্মণদের ফৌজদারি অপরাধের জন্য পীড়ন করা চলবে না একথা বললেও তাঁদের অপরাধের জন্য নানারকম ললাট চিহ্ন অঙ্কন করে অপরাধের চিহ্ন রাখার কথা বলেছেন। চুরি করা বা হত্যা করা বা ব্যভিচার দোষে ব্রাহ্মণদের ললাট চিহ্ন এঁকে দিয়ে তাঁদের অপরাধের কথা সর্বসমক্ষে জানানো এবং তাঁদের রাজ্য থেকে নির্বাসন বা খনি অঞ্চলে বাস করার শাস্তি দানের কথা বলেছেন কৌটিল্য।

দণ্ডবিধান কাজে রাজার যদি ভুল হয় অর্থাৎ দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে যদি তিনি দণ্ড দেন তবে তাঁর উপর ত্রিশগুণ দণ্ড ধার্য হবে এবং এই দণ্ডের ধন জলে বরুণদেবের উদ্দেশ্য প্রদান করতে হবে এবং তার পর তা ব্রাহ্মণদের দান করতে হবে। এই দান দ্বারা রাজার দণ্ড দানের ভুলত্রুটি শেষ হয় এবং এক্ষেত্রে বরুণদেবই হলেন রাজার শাসক।

সৈন্যবাহিনীর গঠন ও ভূমিকা : কৌটিল্যের দণ্ড নীতির প্রধান শক্তি দণ্ডধারী রাজা এবং দণ্ড ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হলেও, সৈন্যবাহিনীই যে দণ্ড প্রয়োগের হাতিয়ার এবং প্রধান কেন্দ্র সে কথা বুঝতে কৌটিল্য তাঁর রাষ্ট্রের সাতটি প্রকৃতির সৈন্যাঙ্গর অন্যতম হিসেবে দণ্ড অর্থাৎ সেনাবাহিনীর কথা বলেছেন। সৈন্যবাহিনীকে সুসংগঠিত করতে না পারলে দণ্ডদান ব্যবস্থা ব্যর্থ হবে একথা ভেবেই কৌটিল্য তাঁর অস্ত্রশাস্ত্রে রাষ্ট্রে জন্য এক বিশাল সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সুপারিশ করেছেন। পদাতিক, রথ, অশ্ব ও হস্তিবাহিনী—সৈন্যবাহিনীর এই চারটি অংশ রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখতে সব সময় প্রস্তুত থাকবে। কোন কোন সমালোচকদের মতে দণ্ডনীতি অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের শক্তি ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও এর কঠোর প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সমানবিক বলে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এছাড়া উচ্চবর্ণের মানুষ বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে এই আইনের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী ও হবসের মতো রাষ্ট্র শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কৌটিল্য, দণ্ডনীতির বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বলে সমালোচকরা মত প্রকাশ করেছেন। তবে এই সব সমালোচনার উত্তরে বলা হয়েছে কৌটিল্যের দণ্ডনীতিকে সমকালের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই বিচার করতে হবে। কৌটিল্য দণ্ডনীতি বলতে বুঝেছেন সেই উচ্চমানের রাজনীতিকে যা রাজাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, ধর্মকে সত্য পথে স্থাপন করে। দুর্নীতিকে কঠোরভাবে দমন করে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে। গবেষকরা স্বীকার করেছেন যে যুগে কৌটিল্য লিখেছেন সেই যুগের তুলনায় তাঁর চিন্তা যথেষ্ট উন্নত ছিল। আইন ও বিচার পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর কিছু সুপারিশ শুধুমাত্র তাঁর যুগেই বিচারেই নয়, পরবর্তী সময়ের বিচারেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। দেওয়ানি-বিধি বিষয়ে কৌটিল্যের ধারণা বা দেওয়ানি মামলা বা তার সাক্ষ্য বিষয়ে কৌটিল্যের মতামত বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিবেচিত হতে পারে কৌটিল্য তাঁর দণ্ডনীতিতে রাজতন্ত্রকে বজায় রেখে, রাজাকে দায়িত্ব সচেতন হওয়ার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন। প্রজার হিতসাধনই রাজার লক্ষ্য। মন্ত্রী, আচার্য, পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়েই রাজা রাজকর্ম সম্পাদন করবেন। রাজ্য শাসনের সঙ্গেই চলে যোগ্য রাজা হওয়ার জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, রাজার দোষ ত্রুটিও দণ্ডনীতির অধীন এবং সেই ত্রুটিও বিচারযোগ্য এবং আইন অনুযায়ী রাজার কাজেরও বিচার করার ও দণ্ডের নির্দেশও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত। গবেষকরা স্বীকার করেছেন যে, যে যুগে কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র' লিখেছেন এবং আর্থ-সামাজিক এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদেশনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সুপারিশ করেছেন তার কিছু সুপারিশ শুধুমাত্র তাঁর যুগের বিচারেই নয়, পরবর্তী সময়ের বিচারেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা যায়।

৪.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) মনস্মৃতিতে ও শুক্রনীতিসার অনুসারে দণ্ডনীতির ব্যাখ্যা দিন।

খ) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দণ্ডনীতিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

৪.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Altekar, A. S. (1949). *State and Government in Ancient India, From Earliest Times To c. A. D. 1200.* Banaras : Motilal Banarsidass.

ii. Kosambi, Damodar Dharmanand. (1956). *An Introduction to the Study of Indian History.* Bombay: Popular Book Depot.

iii. Mookerji, Radhakumud. (1966). *Chandragupta Maurya and his Times.* Delhi: Motilal Banarsidass.

iv. Varma, V. P. (1986). *Ancient and Medieval Indian Political Thought.* Agra : Lakshmi Narain Agarwal.

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-5

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব
Kautilya's Saptanga Theory

বিষয়সূচি :

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৫.২ ভূমিকা

- ৫.২.১ স্বামী (The Master/King)
- ৫.২.২ অমাত্য (Minister)
- ৫.২.৩ জনপদ (Territory/Population)
- ৫.২.৪ দুর্গ (Fort)
- ৫.২.৫ কোষ (Treasury)
- ৫.২.৬ দণ্ড (Army)
- ৫.২.৭ মিত্র (Friend/ally)

৫.৩ উপসংহার

৫.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৫.৫ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানের রাষ্ট্রের প্রকৃতি সংক্রান্ত নানা মতবাদ থাকলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্রে রাষ্ট্রের কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। সর্ব প্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কৌটিল্যের রাষ্ট্রে প্রকৃতি সম্পর্কে এই মতবাদ 'সপ্তাঙ্গ' মতবাদ বা সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই মতবাদটি আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি জানা যাবে সেগুলি হল:

- রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে।
- রাষ্ট্রের যে সাতটি উপাদন বা অঙ্গের কথা তিনি বলেছেন সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।
- গুরুত্ব অনুযায়ী এই উপাদানগুলি ক্রমপর্যায়ে সাজানো আছে যেমন 'স্বামী' গুরুত্ব অনুযায়ী সর্বপ্রথমে আছে আর 'মিত্র' আছে সর্বশেষে। কাজেই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে উপাদানগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যাবে।
- এছাড়া প্রতিটি উপাদানের আদর্শ অবস্থা ও আবশ্যকীয় গুণাবলীর বিষয়ে অবগত হওয়া যাবে যা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

- প্রতিটি অঙ্গ বা উপাদানকে বিশ্লেষণ।

৫.২ ভূমিকা :

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতে প্রথম কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কৌটিল্য যিনি বিষ্ণুগুপ্ত ও চাণক্য নামেও পরিচিত ছিলেন। অর্থশাস্ত্র তাঁরই রচনা যা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম আকর গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। তবে বইটির অস্তিত্ব দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ছিল ১৯০৯ সালে মহীশূরের পণ্ডিত ডঃ আর শ্যামশাস্ত্রী বইটি আবিষ্কার করেন এবং বিভিন্ন টীকাসহ বইটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পটভূমি ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তত্ত্বে-এর বিস্তার সমগ্র উত্তম ভারতে। বিষয়সূচি অনুযায়ী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ১৫টি অধিকরণ, ১৫০টি অধ্যায়, ১৮০টি প্রকরণ এবং মোট ৬০০০টি শ্লোক আছে।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের অনেকের লেখনীতে বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব বর্ণিত ছিল। কৌটিল্যই প্রথম স্পষ্ট, সুসংবদ্ধ, যুক্তিপূর্ণভাবে সপ্তাঙ্গতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৌটিল্য রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের তালিকা দিয়েছেন। সেগুলি হল যথাক্রমে : ''স্বাম্যমাত্যজনপদদুর্গকোশদণ্ডমিত্রাণি প্রকৃতয়ঃ'' অর্থাৎ,

স্বামী (The Master/King)

অমাত্য (Minister)

জনপদ (Territory/Population)

দুর্গ (Fort)

কোষ (Treasury)

দণ্ড (Army)

মিত্র (Friend)

এই সাতটি উপাদান হল রাষ্ট্রের

৫.২.১ স্বামী (The Master/King) :

স্বামী শব্দটিকে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তবে দেখা যায় স্ব অর্থাৎ ভূসম্পত্তি, আম অর্থাৎ কাঁচামাল এবং ইন্ অর্থাৎ আছে। কাজেই এগুলির সমইষ্ঠতেই স্বামী শব্দটির উৎপত্তি। কাজেই একটি রাজ্যের সব ভূসম্পত্তি, কাঁচামাল এগুলির অধিকার আছে কেবলমাত্র স্বামী বা রাজার। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠানে রাজাকেই স্বামী বলে অভিহিত করা হত। কৌটিল্যের মতে স্বামীই হল সপ্তাঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কৌটিল্য রাজতন্ত্রের প্রবল সমর্থক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বংশানুক্রমিক ও উচ্চকুলশীল রাজতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন একজন শারীরিকভাবে অসুস্থ রাজা নতুন রাজার চেয়ে এবং দুর্বল ও উচ্চবংশের রাজার শক্তিশালী কিন্তু নীচ কুলোদ্ভব রাজার থেকে অধিকতর শ্রেয়। এর থেকেই বোঝা যায় কৌটিল্য অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রভৃতির মানুষ ছিলেন। উচ্চবংশের প্রতি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তার অনুরাগ বজায় ছিল। আবার পিতাপুত্রের বা ভ্রাতাদের দ্বৈত শাসন বিজয়ী রাজার শাসনের চেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে কৌটিল্য মনে করতেন। কারণ এঁরা রাজ্যে পূর্বে প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন এবং অতি সহজেই প্রজাদের আনুগত্য লাভ করবেন।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচনার প্রেক্ষাপটে ছিল এমন একটি সময় যখন সারা ভারত ছিল অসংখ্য ছোট-বড়ো রাষ্ট্রে বিভক্ত।

সেখানে কোথায় ছিল আর্যরাষ্ট্র যারা গড়ে উঠেছিল রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আবার বেশিরভাগ অংশটাই ছিল অনার্য রাষ্ট্র। এই দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছল দুস্তর ব্যবধান। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর বৈসাদৃশ্যের জন্য সারা দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তাই বারে বারে বহিঃশক্তির আক্রমণে সারাদেশ বিপন্ন হচ্ছিল। কৌটিল্য অনুধাবন করেছিলেন যে একমাত্র শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রই এই বিভিন্নতা ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় গড়ে তুলতে পারবে। তাঁর অর্থশাস্ত্র ছিল রাজার অবশ্য পালনীয় কতর্ব্যগুলির তালিকায় সমৃদ্ধ যা আত্মস্থ করতে পারলে বিজিগীষু রাজা একজন অতি সুদক্ষ শাসক হয়ে উঠবেন। আর তার জন্য ওই রাজাকে অনেক বেশি রাজ্য জয় করতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে হবে। অনেকেই সমালোচনা করেন যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এক ধরনের সামরিক আক্রমণাত্মক ভঙ্গির অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল।

কৌটিল্যের মতে রাজা হলেন রাষ্ট্র ব্যবস্থার শীর্ষে এবং সকল কর্তৃত্বের উৎস। রাজার মর্যাদা এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়াতে তাঁর শিক্ষান্ত যথাযথ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। অর্থশাস্ত্রে রাজার ও রাজপুত্রদের শিক্ষার বিষয়ে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে শৈশবে রাজপুত্ররা গুরুগৃহে গমন করে ব্রহ্মচর্য পালন করবে তার সাথে শাস্ত্রপাঠ করবে এবং অস্ত্র চালানোর শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই শিক্ষা সমাপ্ত হলে রাজপুত্র গার্হস্থ্যজীবন পালন করবে। কিন্তু এরপরও তাকে রাজপদের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

কৌটিল্য মনে করতেন রাজাকে তাঁর কতর্ব্য পালন করতে গেলে কতগুলি গুণের অধিকারী হতে হবে। চার প্রকার গুণের কথা অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে।

(ক) অভিগামিক গুণ (Qualities of inviting nature)

(খ) প্রজ্ঞাগুণ (Qualities of Intellect)

(গ) উৎসাহ গুণ (Qualities of enthusiasm)

(ঘ) আত্মসম্পৎ (Personal Qualities)

(ক) অভিগামিক গুণ : উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ, ধর্মপরায়ণতা, দৃঢ়বুদ্ধি, সহজে বশ করার ক্ষমতা, অনলস, ধৈর্য্যশীল, বিনয়, দাতা, শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষমতা এই গুণ গুলি থাকলে রাজার প্রজাদের কাছে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তারা সেই রাজার বশ্যতা স্বীকার করে।

(খ) প্রজ্ঞাগুণ : এক্ষেত্রে রাজাকে নীতি ও যুক্তি শোনার ক্ষেত্রে আগ্রহী হতে হবে, উত্তম মরণশক্তির অধিকারী হতে হবে এছাড়াও মনোনিবেশ করা, সঠিক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এই গুণগুলির কথা বলা হয়েছে।

(গ) উৎসাহগুণ : শৌর্য, অমর্যাদা বা পাপাচরণে ক্ষমারহিততা সর্বকার্যে দক্ষতা, শীঘ্র কর্মসম্পাদনে তৎপরতা এগুলি হল উৎসাহগুণের উদাহরণ।

(ঘ) আত্মসম্পৎ : বিপদে স্থিরবুদ্ধি, আত্মসংযম, বাগ্মীতা, পরিবার প্রিয়তা, শত্রুর বিশ্লেষণ, হাসিমুখে অন্তরের ভাব গোপনের ক্ষমতা, আগামী বিষয়ের উপর মনন ইত্যাদি।

এই গুণগুলির সবগুলি না থাকলেও বেশির ভাগ গুণ রাজার মধ্যে থাকলেই সেই রাজা প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠতে পারবেন। রাজপুত্রদের-আন্বীক্ষিকী (Philosophy বা দর্শন), ত্রয়ী (ঋক, সাম, যজু) বার্তা (অর্থনীতি) ও দন্ডনীতি (Science of Politics বা রাজনীতি বিদ্যা) শিক্ষার ওপর কৌটিল্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা এই শিক্ষা ও বিদ্যা রাজাকে জিতেন্দ্রিয় করে তোলে।

ব্যসন : উপরিউক্ত গুণাবলীগুলি রাজা আয়ত্ত করতে না পারলে তার জীবনে ব্যসন বা বিপন্নতা উৎপন্ন হবে যার

ফলে অমাত্য, প্রজা বিক্ষোভ, রাজকোষ ও দন্ডনীতির অপব্যবহার ইত্যাদির জন্য রাজা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য উপদানের তুলনায় ব্যসন হল অত্যন্ত বিপদজনক। কৌটিল্য রাজার আত্মরক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি রাজার কাছের লোকদেরও বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন না। প্রয়োজনে রাজার মহিষী ও সন্তানদের ওপরও গুপ্তচর নিয়োগ করতে বলেছেন। রাজপুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করার পরামর্শ দেবার উপদেশ দিয়ে প্রবল রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজার কর্তব্য : আদর্শ রাজার প্রধান কর্তব্য হল প্রজার কল্যাণ করা। রাজা প্রজাকে সন্তানসম স্নেহ করবেন। পুত্রের মতো প্রজাও যদি পাপাচারী, রাষ্ট্র বিরোধী হয় তবে রাজা তাদের দণ্ড দেবেন। প্রজার হিতেই তার হিত, প্রজার সুখেই সুখ। প্রজাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব ও রাজার আবার প্রজারাও দণ্ড বা শাস্তির ভয়ে রাজার প্রতি অনুবক্ত থাকে। এভাবেই রাজা ও প্রজার মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতা।

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাদান হল রাজা বা স্বামী যা প্লেটোর 'রিপাবলিকের' অভিজাত শ্রেণীর সাথে তুলনীয়।

৫.২.২ অমাত্য (Minister) :

কৌটিল্যের সময় 'অমাত্য' শব্দের মাধ্যমে মন্ত্রীসহ সকল আমলা, প্রশাসক, পরামর্শদাতা, সচিব এদের বোঝানো হত। এদের সাহায্য ছাড়া সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন সম্ভব ছিল না। কৌটিল্যের মতে একটি চাকায় যেমন রথ চলে না তার সহায় প্রয়োজন তেমনি রাজকার্যেও অমাত্যদের সাহায্য প্রয়োজন। মন্ত্রী শব্দটির উৎস হল মন্ত্র ধাতু যার অর্থ হল মন্ত্রণা বা পরামর্শ। অমাত্য, মন্ত্রী ও সচিব এই তিনটি শব্দের মধ্যে খুব সামান্যই প্রভেদ আছে। অমাত্য শব্দটির অর্থ হল আপ্তসহায়ক বা Personal Secretary, মন্ত্রী হল রাজকীয় পরামর্শদাতা আর সচিব হল সাহায্যকারী। কৌটিল্যের সময়ে রাষ্ট্রে প্রশাসন সংক্রান্ত কাজে অমাত্য বা পরামর্শদাতা হিসেবে একদল মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজ্যের পরিধি যত বিস্তৃত হত তার কর্মভার ও জটিলতাও বাড়তো। আর দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি থাকতো তা সমাধান করার জন্য দক্ষ ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী বা পরামর্শদাতার প্রয়োজন হত।

কৌটিল্যের রচনায় রাজার সাহায্যকারী হিসেবে যে পদাধিকারীদের উল্লেখ আছে তাদের মূলত দুইভাগে ভাগ করা হয়।

ক) উচ্চপদস্থ আধিকারীক যাদের মধ্যে আছেন মন্ত্রীও পুরোহিত।

খ) অর্ধস্তন আধিকারীক কাজেই মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, দ্বাররক্ষী, অন্তপুররক্ষক, বিভাগীয় অধ্যক্ষ, রাজস্ব সংগ্রহকারী, কবতুকী, ফৌজদারী বিচারক, সেনাবাহিনীর সামনের সারির নেতা, নগরপাল, প্রধান দেওয়ানী বিচারক, কারুশিল্প সমূহের অধ্যক্ষ, মন্ত্রী পরিষদাধ্যক্ষ, সেনাপ্রধান, দূর্গের রক্ষক, সীমান্তরক্ষক, অরণ্যকারীদের প্রধান শাসক এই উনিশজনকে নিয়ে প্রশাসন পরিচালিত হত। কৌটিল্য মন্ত্রী ও অমাত্যে পার্থক্য করেছেন। অমাত্য নিয়োগ করার সময় স্থান কাল ও প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করলেও মন্ত্রী নিয়োগে বিশেষ নীতি অনুসরণে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে পঁচিশ ধরনের যোগ্যতার মাপকাঠির কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। কাজেই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে কৌটিল্য 'অমাত্য' শব্দের মাধ্যমে মন্ত্রী ও পুরোহিতদের বুঝিয়েছেন।

কৌটিল্য অধিক সংখ্যক মন্ত্রী নিয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর মতো ছিল, রাজা বহুসংখ্যক অমাত্য নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য তিনি তিন বা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। একজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না কারণ সেক্ষেত্রে মন্ত্রীর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। আবার দুজন মন্ত্রীর ক্ষেত্রে তারা সহজেই একজোট হয়ে রাজাকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার চারজনের বেশি থাকলে বিষয়টি না গোপন না থেকে প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে তিন বা চারজন মন্ত্রী থাকলে রাজা প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে একজন দুজন বা তার বেশি মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

রাজার অমাত্যর সংখ্যা অনেক হতে পারে। এরা রাজার অনেকরকম কাজে সাহায্য করেন। কাজগুলি তিনভাবে পরিচালিত হয় প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ও অনুমেয় ভাবে। প্রথম ক্ষেত্রে রাজা নিজে প্রত্যক্ষভাবে কাজগুলি সম্পাদন করে থাকেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজা যে কাজ অন্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। তৃতীয় ক্ষেত্রে কাজের কোনও অংশ থেকে বাকি কাজটি অনুমান করে নিতে হয়। প্রথম ক্ষেত্রে রাজা নিজে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করলেও পরের ক্ষেত্রদুটিতে মন্ত্রী ও অমাত্যদের সাহায্য নেন।

'অধ্যক্ষ প্রচার' শীর্ষক অধ্যায়ে কৌটিল্য বিভিন্ন পদাধিকারীর অমাত্য ও তাদের পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে নির্দেশ করেন কৌটিল্যের মতে অমাত্যের প্রধান কাজ হল নীতি ও পদ্ধতি স্থির করা। কাজ শুরু করার আগেই নীতি নির্ধারণ করতে হয়। এই নীতি নির্ধারণ বা মন্ত্রণা পাঁচরকম হয় সেগুলি হল—ক) রাজ্যের ক্ষেত্র আর বিদেশ ক্ষেত্র, খ) পুরুষ দ্রব্য সম্পদ অর্থাৎ দক্ষ লোক নিযুক্ত করা, গ) দ্রব্য সম্পদ, রত্ন, ইত্যাদি বিষয়ক নীতি স্থির করা, ঘ) কাজ শুরু করার পর বাধাবিঘ্ন এলে কিভাবে ও কার সঙ্গে পরামর্শ করে তার সমাধান হবে সে বিষয়ে চিন্তা করা, ঙ) ওই কাজে কি ফললাভ বা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা আলোচনা। এই পাঁচরকম মন্ত্রণা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রীরা রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজা তাদের মাধ্যমেই সকল বিষয়ে অবগত হন। মন্ত্রীদের মাধ্যমেই সকল সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। রাজ্যের সাফল্য ও ব্যর্থতা এই মন্ত্রীদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। এই মন্ত্রীদের নিয়োগ পদ্ধতিতে তাই অতি বিচক্ষণতার সাথে সাহায্য করতে হয়। সাধারণত উচ্চকূল বংশের মন্ত্রীরা কৌটিল্যের মতে আদর্শ বলে বিবেচিত। মন্ত্রী ও অমাত্যদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কৌটিল্য চার প্রকার পরীক্ষার কথা বলেছেন—

ক) ধর্মপোধা (religious allurement)

খ) অর্থপোধা (monetory allurement)

গ) কামোপধা (love allurement)

ঘ) ভয়োপধা (allurement under fear)

'উপাধা' শব্দের অর্থ হল ছলনা, গুপ্তচরের মাধ্যমে মন্ত্রী ও অমাত্যদের উপরোক্ত চার প্রকার ছলনার মাধ্যমে পরীক্ষা করার কথা কৌটিল্য বলেছেন। ধর্ম সংক্রান্ত ছলনার মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে বিচারকার্যে, অর্থ বিষয়ক ছলনার মাধ্যমে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে রাজস্ব সংগ্রাহক, কাম বিষয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে অন্ত:পুররক্ষক আর ভয় থেকে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে অঙ্গরক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করার কথা বলেছেন আর যারা এই চার প্রকার পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হবে তারা তাঁদের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা উচিত বলে তিনি মনে করেছেন।

পুরোহিত : যদিও সপ্তাঙ্গতত্ত্বে পুরোহিতের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ নেই কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রশাসনের মধ্যে পুরোহিতের ও উল্লেখ আছে। কৌটিল্য সর্বদা রাজাকে পুরোহিতকে মেনে চলার উপদেশ দিতেন। মূলত শাসন পরিচালনা করার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ওই বিষয়ে ধর্মের বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজনীয় হত। এ বিষয়ে রাজাকে সচেতন করার দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা কুলগুরুর। এঁনারা অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিরূপে সমাজে মর্যাদা পেতেন। কৌটিল্য মনে করতেন শিষ্য যেমন তার গুরুকে, পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে যেভাবে অনুসরণ করে তেমনি রাজাও যেন পুরোহিতকে অনুসরণ করে।

৫.২.৩ জনপদ (Territory/Population) :

কৌটিল্যের মতে 'জনপদ' রাষ্ট্র দেশ প্রভৃতি শব্দগুলি একই অর্থ বহন করে। জনশূন্য জনপদ যেমন অকল্পনীয় তেমনি জনপদহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বও অসম্ভব। রাজাকে জনপদের সুরক্ষা ও সুব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মনোযোগী ও যত্নশীল হবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। কারণ কোনও একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা, সাফল্য এগুলি অনেকাংশে নির্ভর করে 'জনপদ' নামক তৃতীয় উপাদানটির ওপর।

কোনও একটি জনপদ যদি জনসংখ্যার স্ফীত হয়ে ওঠে তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অপসারিত করে নতুন জনপদে তাদের স্থাপন করা উচিত। আবার কোনও এলাকা যদি জনহীন হয়ে পড়ে তবে নতুন জয় করা রাজ্য থেকে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত করে সেখানে আনতে হবে। আসলে জনপদ হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান যেখান থেকে রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন অর্থ, সৈন্যদল, তামা ও লোহা প্রভৃতি করা হয়। এমনকি রাজা যখন নতুন কোনও রাজ্য জয় করেন সেখানকার মানুষ যেন সেই জনপদ থেকে সরে না যায় সে বিষয়েও রাজাকে যত্নবান হতে হবে এবং সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ তিনি করবেন। কারণ জনগণ ছাড়া কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব।

কৌটিল্যের মতে আদর্শ জনপদের বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। জনপদের মানুষ রাজার শত্রুকে নিজের শত্রু বলে মনে করবে। জনপদবাসী যেন রাজাকে কর বা জরিমানা দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষম হয়। ওই স্থানের ভূসম্পত্তির মালিকেরা যেন সুবিবেচক হন আর নিম্নবর্ণে মানুষের সংখ্যাও যেন অনেক বেশি হয়। এই জনপদে প্রতিটি গ্রামে একশত থেকে পাঁচশত পরিবার থাকবে। দশটি গ্রাম নিয়ে হবে 'সংগ্রহণ'। চারশোটি গ্রামের মাঝে থাকবে উপনগর বা 'দ্রোণমুখ'। আর আটশোটি গ্রামের মাঝে থাকবে নগর বা কৌটিল্যের ভাষায় 'স্থানীয়'। আদিবাসী সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য ছিল যে কৃষিকাজে পারদর্শী, ভদ্র, রাজঅনুরাগী প্রজাদের অধিকাংশ উৎপাদক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৫.২.৪ দুর্গ (Fort) :

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের 'দুর্গানিবেশ' অধ্যায়ে রাষ্ট্রের দুর্গ সম্পর্কে পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুর্গগুলি ছিল অনুপম স্থাপত্যবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচয়বহনকারী। সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদন হল দুর্গ। এই দুর্গের প্রধান প্রয়োজনীয়তা হল রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে এমন করে দুর্গ তৈরি করা যাতে শত্রু যেন সেখানে সহজে প্রবেশ করতে না পারে। নগরের তিন দিকে তিনটি করে পরিখা থাকবে। তার পাশে থাকবে পাথরের উঁচু দেওয়াল এবং একটি রথ চলার মতো প্রশস্ত পরিসর। এই নগর দুর্গের মধ্যেই থাকবে রাজার অট্টালিকা। রাজ আসন, গুপ্তপথ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য দেওয়াল, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য উপযুক্ত কোটর ইত্যাদি।

কৌটিল্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী চার রকম দুর্গ থাকতে পারে—জলদুর্গ, যার চারপাশে নদী থাকবে, গিরিদুর্গ যা প্রচুর গুহা সম্বলিত পর্বতে স্থাপিত হবে, মরু এলাকায় মরুদুর্গ, আর বনদুর্গ যা দুর্গম ঘন অরণ্যে স্থাপিত হবে। এই সব দুর্গে সব বর্ণ ও পেশার কারিগর ও দেবতাদের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সীমানায় থাকবে প্রান্তরদুর্গ। এই দুর্গগুলির স্থাপত্য, সেগুলির প্রযুক্তি, সামরিক কৌশলগত সুবিধা এ নিয়ে কৌটিল্য বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৫.২.৫ কোষ (Treasury) :

রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদন হল কোষ বা অর্থ ভান্ডার। আদর্শ রাজার ভান্ডারে প্রচুর পরিমাণে সোনা, রুপা, অর্থ, মূল্যবান রত্ন সঞ্চিত থাকবে। রাজকোশ এমন হবে যেন দুর্ভিক্ষ বা অনুরূপ বিপদে ব্যয় করা সম্ভব হয়। আবার কোষে যথেষ্ট অর্থ থাকলে তবেই সেনাবাহিনীর আনুগত্য নিশ্চিত করা যায়। অন্য রাজ্যের থেকে মিত্র সংগ্রহ বা শত্রুনিগ্রহের বিষয়টিও কোষের ওপর নির্ভরশীল। রাজ্যের মধ্যে যে কোনও কাজে উদ্যোগ নিতে গেলে বা অন্য রাষ্ট্রের ভূমি দখল করতে গেলে কোষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কারণেই কোনও বৃদ্ধি প্রয়োজনে রাজা অর্থনৈতিক উন্নতি অর্থাৎ শস্য উৎপাদন বাণিজ্যিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখেন।

রাজকোষের প্রধান উৎস হল রাজকর। সাধারণত উৎপাদনের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসেবে প্রদত্ত হলেও সঙ্কটকালে ওই কর হার এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ করার পরামর্শ কৌটিল্য দিয়েছেন। কৌটিল্য রাজকোষের সুরক্ষা বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এখানে শুধু অর্থই সংগৃহীত হয় না। জনগণের প্রদেয় বস্তুগুলি মজুত করার জন্য পণ্যগৃহ, খাদ্য

দ্রব্য সঞ্চয় করার স্থান, কাঠ, বাঁশ, লতাপাতা, শিকড়, বিষ এগুলি সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় স্থান নির্মাণের কথা বলেছেন কৌটিল্য। এই কাজের জন্য নিযুক্ত একজন রাজকর্মচারী থাকবেন যিনি 'সন্নিধাতা' নামে পরিচিত। আর রাষ্ট্রীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা, জনচেতনা বৃদ্ধি করা কর আদায়ের কারণগুলি জনসমক্ষে বিশ্লেষণ করা বা করদাতাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দেওয়া, এই সব বিষয়ে রাজাকে যিনি পরামর্শ দেবেন তিনি সমাহর্তা নামে পরিচিত। অর্থশাস্ত্রে করদাতা হিসেবে যাঁদের উল্লেখ আছে তারা হলেন—কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবি, নটী-নর্তকী শিল্পীরা এবং জরিমানা প্রদানকারী অপরাধীরা। এই রাজকোষ বৃদ্ধি করার কতকগুলি কৌশলের কথাও কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। যেমন—ক) রাজ্যের এলাকাবৃদ্ধি যার ফলে কৃষিক্ষেত্র বাড়বে খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাড়বে, খ) দস্যু ও চোরদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দান, গ) সরকারি বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের চুরি বন্ধ করা, ঘ) শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগী হওয়া যাতে রাজ্যের লভাংশ বৃদ্ধি পায়, ঙ) কর ছাড় না দেওয়া, চ) সোনা-রুপা-নগদ অর্থ নজরানা হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্য বিশ্বাস করতেন রাজার কোনও যদি সমৃদ্ধ না থাকেন তবে তিনি প্রজাদের অনৈতিকভাবে পীড়ন করবেন বা উত্যক্ত করবেন। এই রাজকোষের ওপর রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গগুলি শুধু জড়িতই নয় বরং কিছুটা নির্ভরশীলও বটে।

৫.২.৬ দণ্ড (Army) :

দম্ ধাতু থেকে দণ্ড শব্দটির উৎপত্তি। দণ্ড শব্দটির অর্থ হল দমন করা। কৌটিল্যের মতে দণ্ডের প্রধান অর্থ সেনাবাহিনীর সাহায্যে বল প্রয়োগের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা সুরক্ষিত থাকে। তিনি আরও বলেছেন, আন্বীক্ষিকা, ত্রয়ী ও বার্তা, এই তিনটি নীতির সাহায্যে রাজ্যের সমৃদ্ধি অর্জন করা ও তাকে সুস্থ রাখার কাজ করে দণ্ড। কাজেই সপ্তাঙ্গে তত্ত্বের ষষ্ঠ উপাদানটির ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক দিক হল রাষ্ট্রের ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এই কাজে সাহায্য করবে যে সেনাবাহিনী তারা রাজার প্রতি বিনয়ী ও অনুগত হবে, কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবে। সর্বোপরি তারা ক্ষত্রিয় বংশের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৌটিল্যের মতে যা দেশে নেই তা যোগ করাই শ্রেয়। যা আছে তাকে রক্ষা করা, যা সুরক্ষিত তাকে বৃদ্ধি করা এবং যা বেড়েছে তা উপযুক্ত উন্নয়নের কাজে লাগানোই হল দণ্ডনীতির প্রধান দায়িত্ব। তবে দণ্ডের তীক্ষ্ণতা বা নিয়ন্ত্রণহীন বল প্রয়োগকে কৌটিল্য সমর্থন করেননি। তিনি বুঝেছিলেন সতর্কভাবে দণ্ডনীতি প্রণীত না হলে দেশের কল্যাণ সাধন হয় না। কঠোর দণ্ড মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও ত্রাস সঞ্চার করে আবার লঘু দণ্ড রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। প্রজাকে অসুখী করে। কাজেই যথাযথ দণ্ড রাজা ও প্রজাকে সুখী করে, দেশের সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করে।

৫.২.৭ মিত্র (Friend/ally) :

রাষ্ট্রের সপ্তম উপাদান হল মিত্র। যে সব রাজার সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি বা মৈত্রীর ফলস্বরূপ পারস্পরিক সহায়তা ও যোগাযোগের সৃষ্টি হয়েছে তাদেরই মিত্র রাজা হিসেবে দেখতে হবে। কৌটিল্য মনে করতেন মিত্র হবে বংশপরম্পরায় অর্থাৎ পিতা পিতামহদের মিত্ররাই পরবর্তীকালেও মিত্র থাকবে তাই তাদের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব থাকবে। আর রাজার স্বার্থের সাথে মিত্রের স্বার্থ ও অভিন্ন হবে। মিত্রশক্তি হল রাষ্ট্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজার শক্তি শুধু তার নিজস্ব শক্তির মাধ্যমেই পরিমাপ করা যায় না মিত্র শক্তির পরিমাপও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। তাই রাজা কৌশলে নিজের এবং অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে নিজের অনুকুলে নিয়ে আসবেন। সুতরাং মিত্র সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত জরুরি। প্রাচীন ভারতেও যেমন মিত্র শক্তি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ছিল তেমনি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই মিত্র সংগ্রহের জন্য রাজা দক্ষভাবে কূটনীতির পরিচালনা করবেন এবং সন্ধি যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি কৌশল গ্রহণ করবেন।

তবে শুধু মিত্রই নয় কৌটিল্য মিত্রের সাথে সাথে 'অরি' বা শত্রুরও শক্তির পরিমাপ করতে বলেছেন। তবে রাষ্ট্রের

সাথে যেহেতু অরি-র সম্পর্ক শত্রুর তাই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের অরির উল্লেখ নেই কারণ এই অরিই রাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

৫.৩ উপসংহার :

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের প্রত্যেকটি উপাদান একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের আলোচনাকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

মানব শরীর যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রও তেমনি কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টিতে গঠিত হয়। কৌটিল্য রাষ্ট্রের এই সাতটি অঙ্গকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করলেও অন্যান্য অঙ্গগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেননি। তবে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব অনেকটা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। তবে হাবার্ট স্পেনসরের জৈব মতবাদের থেকে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব কিছুটা পৃথক। স্পেনসার রাষ্ট্রকে প্রাণী দেহ ও ব্যক্তিকে দেহকোষের সাথে তুলনা করেছেন। কৌটিল্য অন্য দিকে রাষ্ট্রকে জীবদেহ তুল্য এবং রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানকে দেহের সাতটি অঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। জীবদেহে যেমন প্রতিটি অঙ্গের নিজের নিজের ভূমিকা আছে এবং তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হয়। জীবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যেমন অঙ্গগুলির কোনও কর্ম দক্ষতা থাকে না তেমনি রাষ্ট্রের উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত : অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী কৌটিল্য বর্ণিত রাষ্ট্র ছিল জনকল্যাণকর রাষ্ট্র যার মূল দুটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজসেবামূলক কাজ ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কাজ। অর্থশাস্ত্রে এই দুই প্রকারের ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সঠিক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করতে, অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে বাজারে যেন অন্যায়ভবে দ্রব্য মজুত করতে না পারে সেদিকে সচেতন হতে। প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ, পান্থশালা নির্মাণ, বিবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ কর ছাড়, কৃষির উন্নতি বিধান, ইত্যাদি। এছাড়াও অনাথ, আতুরদের দায়িত্ব গ্রহণ, অপোক্ত, বয়স্ক, পিতৃ-মাতৃহীন শিশু, স্বামী পরিত্যক্তা বিধবা নারীদের সাহায্য রাষ্ট্রের কর্তব্য অর্থাৎ সকলের প্রতি সমান ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সেবাদান ও সুরক্ষা বিধানের কথা উল্লেখ করে কৌটিল্য রাষ্ট্রকে প্রজা কল্যাণকারী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত : কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ'। অর্থশাস্ত্রে 'অধ্যক্ষ প্রচার' নামক অধ্যায়ে পুরোহিতের উল্লেখ থাকলেও তিনি ছিলেন ধর্মবিষয়ে রাজার পরামর্শদাতা। সেই পরামর্শ গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে রাজা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এও অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে বিশেষ শাস্তিযোগ্য অপরাধে রাজা পুরোহিতকে দণ্ডদান করতে পিছপা হবেন না।

চতুর্থত : প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্রের ওপর। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে যা সার্বভৌমিকতা বলে পরিচিত, প্রাচীন ভারতে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারী রাজাই ছিলেন। তবে রাজা ছিলেন প্রজাবৎসল ও প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধনে দায়বদ্ধ। তাছাড়া 'অমাত্য' ধারনার মাধ্যমে কোটিল্য যা বোঝাতে চেয়েছেন তা আধুনিককালের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। কাজেই কৌটিল্যের চিন্তা শুধু আধুনিকই নয় সুদুরপ্রসারীও বটে।

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের সাথে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের ভাবনার সাদৃশ্য বর্তমান। 'বিগাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো বর্ণিত অভিভাবিক, যোদ্ধা, কারিগর এর সঙ্গে কৌটিল্যের স্বামী, দণ্ড, জনপদ, এগুলির মিল পাওয়া যায়। এছাড়া কৌটিল্যের রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বের তিনটি উপাদানের সাথে এঙ্গেলসের ভাবনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কৌটিল্যের 'অমাত্য'র তুলনা করা যায় এঙ্গেলস বর্ণিত "public official" দের সাথে। কৌটিল্যে অমাত্যকূল অভিজাত শ্রেণী থেকে আগত এবং উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে উন্নীত হয়ে উচ্চপদে নিযুক্ত। সাধারণ মানুষের কাছে তারা সম্মানীয়। দ্বিতীয়ত:

এঙ্গেলসের 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা' সশস্ত্র সৈন্য, কারাগার ও অমান্য দমনমূলক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয় যা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান দণ্ডের অধিকারী হল ক্ষত্রিয়কূল। এখানে সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকা নেই। তৃতীয়ত: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য এঙ্গেলস্ জনগণের থেকে কর সংগ্রহের কথা বলেছেন তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কথা কৌটিল্যও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মত ছিল কোনও একটি উপাদান দুর্বল হলে অন্য উপাদানগুলি প্রভাবিত হতে বাধ্য।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে ডঃ ভারতী মুখার্জী মন্তব্য করেছেন যে ''কোটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব আধুনিক গুণসম্পন্ন। বর্তমান যুগেও সার্বভৌমিকতা, ভূখণ্ড, সামরিক শক্তি সুসংহত রাষ্ট্রকৃত্যক, অর্থনৈতিক শক্তি এবং শক্তিশালী মিত্র রাষ্ট্রের মূল উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কোটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে আধুনিক।"

৫.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) কৌটিল্য বর্ণিত রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব আলোচনা কর।

খ) রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে রাজা ও অমাত্যর গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা কর।

৫.৫ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Altekar, A. S. (1949). *State and Government in Ancient India, From Earliest Times To c. A. D. 1200.* Banaras : Motilal Banarsidass.

ii. Ghosal, U. N. (1959). *A History of Indian Political Ideas: The Ancient Period and The Period of Transition to the Middle Ages.* Bombay: Oxford University Press.

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-6

কৌটিল্যের মণ্ডলতত্ত্ব
Kautilya's Mandala Theory

বিষয়সূচি :

৬.১ পাঠ-উদ্দেশ্য
৬.২ ভূমিকা
৬.৩ কৌটিল্যের মণ্ডলতত্ত্ব
৬.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
৬.৫ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককের মূল উদ্দেশ্য হল :

- মণ্ডলতত্ত্ব, ষাড়গুণ্য তত্ত্ব এগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করা।
- পাশাপাশি সন্ধি ও যুদ্ধের প্রকার, দূতের ভূমিকা, চতুঃউপায় এগুলি সম্পর্কেও পাঠককে ব্যাখ্যা করা।
- রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলীর তত্ত্বের সাদৃশ্য তুলে ধরা।
- আর সর্বোপরি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কৌটিল্যের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিও সমগ্র এককটিতে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা।

৬.২ ভূমিকা

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক ছিলেন। তার রচিত অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগকৌশল ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে পররাষ্ট্রনীতিতে রাজার সাফল্যেব লক্ষ্য তিনটি হওয়া উচিত—মিত্রলাভ, স্বর্ণ বা ঐশ্বর্য্যলাভ, ভূমিলাভ। তবে তিনটির মধ্যে শেষটি লাভ করলে বাকীগুলিও সহজে লাভ করা যাবে। কাজেই রাজ্যের ভৌগলিক এলাকার বিস্তৃতিই হবে মূল লক্ষ্য আর এই লক্ষ্যমাত্রায় রেখেই রাজা তার কর্তব্যস্থির করবেন এবং অন্য রাষ্ট্রের বিরোধীশক্তিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসবেন।

অর্থশাস্ত্রের সপ্তম অধিকরণে কৌটিল্য ভৌগলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে রাজমণ্ডলতত্ত্বের মাধ্যমে বিহিগীষু রাজার চারপাশের বিদেশী রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলের কথা ব্যাখ্যা করেন। আর কূটনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ষাড়গুণ্য তত্ত্বের অবতারণা করেন। এগুলি হল সফল কূটনীতির বৈশিষ্ট্য আর এর সঠিক প্রয়োগের ওপরই পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য নির্ভরশীল।

৬.৩ কৌটিল্যের মণ্ডলতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে কূটনীতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত। কোন রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, রাষ্ট্রের সীমানার প্রসার ঘটানো প্রভৃতি বিষয়গুলি নির্ভর করতো অন্যরাষ্ট্রের অবস্তান ও গতিপ্রকৃতির ওপর। কৌটিল্যে তাঁর অর্থশাস্ত্রের অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় ও সপ্তম অধিকরণ জুড়ে, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কোন রাষ্ট্র তা শক্তিশালী হোক বা দুর্বল, তার সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কূটনীতি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁর নির্মিত কূটনীতি তত্ত্বটি সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মৌলিক এবং বর্তমানের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সমসাময়িক ক্ষমতার রাজনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের শক্তির তারতম্যকে বিবেচনা করে তিনি যে অভিনব তত্ত্ব রচনা করেছেন তা কূটনীতির মণ্ডলতত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ।

ইউ.এন. ঘোষাল তাঁর, 'A History of Indian Political Ideas'. গ্রন্থে বলেছেন, ''মণ্ডলতত্ত্ব শত্রুতা মিত্রতা এবং নিরপেক্ষ সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রকাশিত করে যার কেন্দ্রস্থলে বিজিগীষু রাজার অবস্থান।'' নিজের ক্ষমতা ও রাজ্যের এলাকা বৃদ্ধি করতে কোন রাজা কীভাবে অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনা করবেন সেই বিষয়টি কৌটিল্য আলোচনা করেছেন তার মণ্ডল তত্ত্বের মাধ্যমে। এখানে রাজার চারিদিকে শত্রু ও মিত্র অবস্থান করে। দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠা দশ রাজ্যমণ্ডল তার সাথে মধ্যম ও উদাসীন এই দুটি নিয়ে গড়ে ওঠে দ্বাদশ রাজ্যমণ্ডল।

মণ্ডলতত্ত্বে দ্বাদশ রাজমণ্ডলের বর্ণনায় কৌটিল্য বৈরিতা, মিত্রতা ও নিরপেক্ষ অবস্থানের যে রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মাঝখানে বিজিগীষু রাজার অবস্থান যে রাজা জয় করতে চান। এই বিজিগীষু রাজার সামনে আছেন পাঁচজন রাজার। বিজিগীষু রাজার রাজ্যের পরিধির যেকোন অংশে অবস্থিত রাজা হলেন রাজার স্বাভাবিক শত্রু বা '**অরি**'। অরির রাজ্যের সীমান্তের রাজা যিনি 'অরির' স্বাভাবিক শত্রু তিনি আবার বিজিগীষু রাজার '**মিত্র**', মিত্ররাজ্যের সীমান্তবর্তী রাজা হল মিত্রের শত্রু অথচ অরির মিত্র অর্থাৎ '**অরিমিত্র**' নামে পরিচিত। আর অরিমিত্র রাজার সীমান্তবর্তী রাজা হলেন মিত্ররাজার স্বাভাবিক বন্ধু বা '**মিত্রমিত্র**', সার সীমান্তবর্তী রাজা অরিমিত্রের স্বাভাবিক বন্ধু। তিনি '**অরিমিত্রমিত্র**' নামে পরিচিত।

ঠিক একইভাবে বিজিগীষু রাজার পশ্চাৎভাগে চারজন রাজার অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। বিহিগীষু রাজার ঠিক পশ্চাৎদিকে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাকে বলা হয় '**পার্ষিওগ্রাহ**' (পিছন দিকের শত্রু)। অর্থাৎ তিনি অরির সুবিধার জন্য বিজিগীষুর পশ্চাৎভাগ গ্রহণ করে বলে বিজিগীষুর সঙ্গে তার স্বাভাবিক শত্রুর সম্পর্ক। 'পার্ষিতগ্রাহের' পশ্চাতে তার শত্রু অথচ বিহিগীষুর মিত্র '**আক্রন্দ**' নামে পরিচিত। এই আক্রান্দের পশ্চাতে যে রাজার অবস্থান তিনি পাষিতগ্রাহের মিত্র তার নাম হল '**পাষিতগ্রাহসার**'। আর 'পাষিতগ্রাহসারের' শত্রু হল আক্রন্দের মিত্র যিনি **আক্রানন্দমার** নামে পরিচিত। সম্মুখভাগের পাঁচজন রাজা ও পশ্চাতভাগের চারজন রাজা ছাড়াও দ্বাদশ রাজমণ্ডলে আরো দুজন রাজার অবস্থান প্রত্যক্ষ করা যায়। যারা '**মধ্যম**' ও '**উদাসীন**' নামে পরিচিত। মধ্যম হলেন সেই রাজা যিনি বিজিগীষু ও অরির উভয়ের সন্নিকটে অবস্থান করে। তিনি উভয় রাজাকেই অনুগ্রহ করতে অসমর্থ আর যে কোন একজনের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিহত করতেও অসমর্থ হন। অন্যদিকে 'উদাসীন' হলেন সেই প্রকারের রাজা যিনি অরি ও বিহিগীষুর থেকে দূরে অবস্থান করেন যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, বিহিগীষু, অরি, মধ্যম একত্রে বা আলাদাভাবে তাকে আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করতে সক্ষম। অধ্যাপিকা বারতীয় মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা গ্রন্থে, কূটনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক অধ্যায়ে এই দ্বাদশমণ্ডলের অবস্থানটি যে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন তা হল নিম্নরূপ।

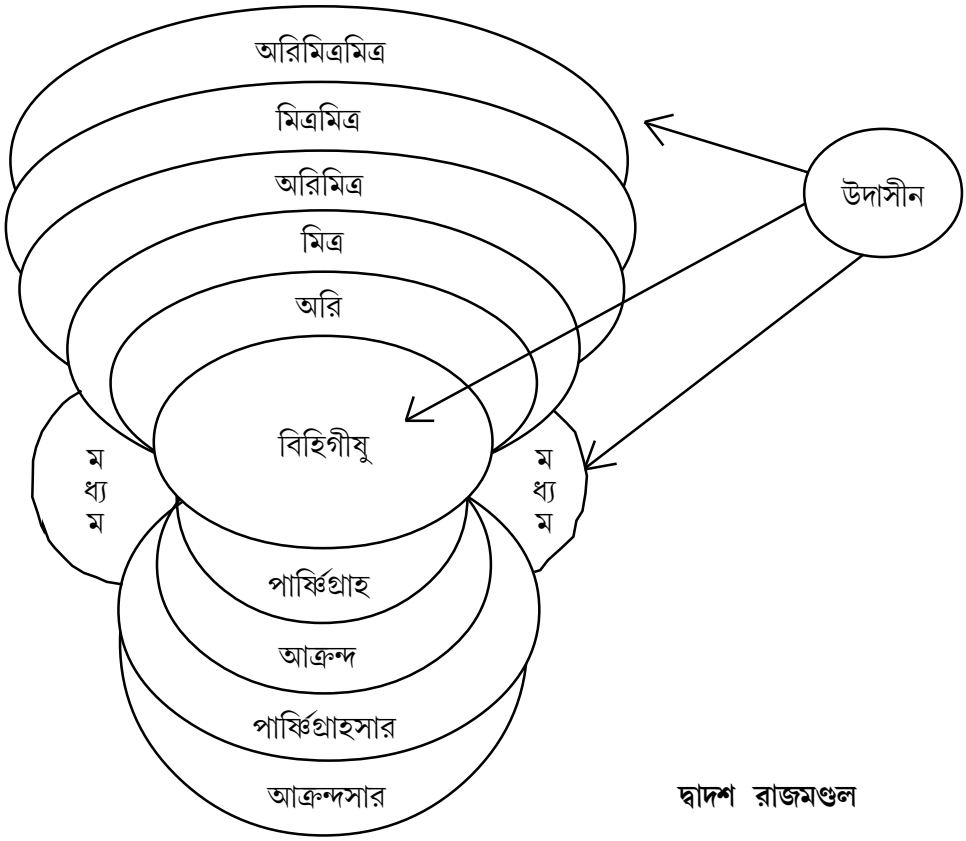

দ্বাদশ রাজমণ্ডল

এই দ্বাদশ রাজার আবার প্রত্যেকেরই অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোল এবং দণ্ড প্রভৃতি পাঁচটি উপাদান বা প্রকৃতি রয়েছে। সুতরাং ১২ জন রাজা এবং প্রত্যেক রাজার পাঁচটি করে উপাদান বা প্রকৃতি মোট ৭২টি (১২ + ৫ × ১২) উপাদান নিয়ে কৌটিল্যের আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুতরাং বিগিনীষু রাজা বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ৭২টি উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সচেতন থাকবেন। এই দ্বাদশ রাজমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থান করে অপর একাদশ রাজার কার্যাবলী ও গতিবিধির ওপর নজর রাখা বিজিগীষু রাজার অন্যতম কর্তব্য। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই মণ্ডলতত্ত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিহিগীষু রাজার সম্মুখের পাঁচজন পশ্চাতের চারজন, বিজিগীষু নিজে এবং মধ্যম ও উদাসীনকে নিয়ে যে দ্বাদশ রাজমণ্ডল গঠিত হয়েছে সেখানে ভৌগোলিক উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিত্র ও শত্রু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় পাকিস্তান ও চীন ভারতকে আক্রমণ করলে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল। একইভাবে কিউবা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক, আরব-ইস্রায়েল, ইরাক-ইরান। পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সম্পর্ক মণ্ডলতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জীর মতে মণ্ডলতত্ত্ব ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্বের (Balance of Power) প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ করে। তিনি আরও বলেন যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ঐসব রাষ্ট্রের সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারণ করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই মূল বিষয়টি মণ্ডলতত্ত্বে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই দ্বাদশ রাজমণ্ডলকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই হবে ষাড়াগুণ্য তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য।

ষাড়গুণ্য তত্ত্ব (Theory of Six gunas) :

কৌটিল্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মণ্ডলতত্ত্বের উৎপত্তির কারণ হল এই ষাড়গুণ্য তত্ত্ব। এর মধ্যেই কূটনীতির তাৎপর্য নিহিত। ষাড়গুণ্যের ফল তিনরকম—(ক) ক্ষতি অর্থাৎ বিজিগীষুর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি। (খ) স্থান-এর অর্থ হল একপ্রকার স্থিতাবস্থা যা খুব ভালোও না আবার মন্দও না; বৃদ্ধি (উন্নতি বা উপায়)।

কূটনীতির ছটি কৌশলের কথা কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন যেগুলিকে একত্রে বলা হয় ষাড়গুণ্য। এগুলি হল যথাক্রমে—

সন্ধি (Agreement with Pledge) : এক্ষেত্রে ভূমি, কোল, সামরিক আদান-প্রদান বিষয়ে দুই রাজার মধ্যে চুক্তিকেই সন্ধি বলা হয়। যে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থিতির জন্য সন্ধি ও যুদ্ধ উভয়ই প্রয়োজন। তবে যুদ্ধের তুলনায় সন্ধি অধিক গ্রহণযোগ্য কারণ যুদ্ধের ফলে অধিক ক্ষয়, ক্ষতি ও মানুষের দুর্গতি বৃদ্ধি পায়। আসলে বিজিগীষু রাজা শত্রু অপেক্ষা নিজেকে দুর্বল মনে করলে কৌটিল্যের মত অনুযায়ী সন্ধি করাই শ্রেয়।

তবে কৌটিল্য সন্ধি করার ক্ষেত্রে কতগুলি আদর্শ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন যেমন :

বিজিগীষু যখন নিজের দুর্গের মাধ্যমে শত্রুর দুর্গ ধ্বংস বা বিনষ্ট করতে পারবেন, শত্রুর প্রকৃতিসম্পদ উপভোগ করতে পারবেন। যদি সন্ধির মাধ্যমে শত্রুর বিশ্বাস আদর্শের মাধ্যমে গুপ্তচর দ্বারা বিশই প্রকৃতির মাধ্যমে শত্রুর দুর্গগুলি বিনষ্ট করতে পারেন, অথবা বিজিগীষু প্রচুর বলবান হওয়ায় শত্রুরাজা প্রচুর ধনসম্পত্তির পরিবর্তে সন্ধিতে আবদ্ধ হলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়াও বিজিগীষু শত্রুর জনগণকে পীড়িত করতে পারে। শত্রুরাজার অধিবাসীদের নানাপ্রকার সাহায্যের মাধ্যমে জনপ্রিয় হতে পারেন। অন্যদিকে শত্রুর শত্রুর সাথে সন্ধি করলেও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ফলে অনেক সময়ে শত্রুর জনপদ বিজিগীষুর নিয়ন্ত্রণে আসে। আর শত্রু সৈন্যদল দিয়ে সাহায্য করেও শত্রুদের নিজের বশে আনা যায়।

কাজেই সন্ধিতে উপনীত হবার এই শর্তগুলি যথেষ্ট কৌশলী ও বাস্তবসম্মত।

সন্ধি নানা প্রকারের হতে পারে। সাময়িকভাবে যে সন্ধি হয় তাকে চলশক্তি এবং স্থায়ী সন্ধিকে স্থাবর সন্ধি বলা হয়। পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে সন্ধি করা হয় তাকে বলা হয় পরিপণিত সন্ধি অন্যদিকে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব হলে তাকে অপরিপণিত সন্ধি বলা হয়। ছলনার মাধ্যমে যে সন্ধি হয় তাকে অনতিসন্ধি বলে।

শর্তের ওপর ভিত্তি করে সন্ধিকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয় :

(১) মিত্রের সঙ্গে নিশ্চিত ও স্থির শর্তে যে সন্ধি হয় তাকে **মিত্রসন্ধি** বলে।

(২) স্বর্ণলাভের জন্য যে সন্ধি তাকে **হিরণ্যসন্ধি** নামে পরিচিত।

(৩) ভূ-সম্পত্তি লাভ করা যে সন্ধির উদ্দেশ্য তাহল **ভূমিসন্ধি।**

(৪) **কর্মসন্ধি**-র ক্ষেত্রে উভয়ের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সৈন্য ও কোল ব্যবহারের শর্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়।

(৫) যে ভূমিতে এখনও বসতি তৈরী হয়নি সে অংশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যে সন্ধি হয় তাকে বলে **অনবসিত সন্ধি।**

সন্ধি নিশ্চিত করতে গেলে উভয়পক্ষকে শপথ গ্রহণ করতে হয়। তবে কৌটিল্যের মতে এধরনের সন্ধির ক্ষেত্রে কোন জামিন রেখেই সন্ধি করতে হয়। এই জামিন রাখার বিষয়টি আরো চিত্তাকর্ষক। এই ক্ষেত্রে বিহিগীষু এমন কাউকে জামিন রাখবেন যিনি বিহিগীষুর কাজে ভারস্বরূপ বা প্রয়োজনীয় নয়। সেক্ষেত্রে তিনি বেছে নেবেন, দোষযুক্ত অমাত্য, অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত, বীর্য্যহীন পুত্র, কন্যা প্রভৃতি। তিনি প্রাজ্ঞ, সুশিক্ষিত, শক্তিমান পুত্রকে কখনই জামিন রাখার কথা কল্পনা করবেন না। এর থেকে বোঝা যায় কৌটিল্য বিহিগীষুর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনে ছলনা, কৌশল, অনৈতিক উপায় কোন কিছু অবলম্বন করতেই দ্বিধা করতেন না।

ষাড়গুণ্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল :

বিগ্রহ (Warfare) : কোটিল্য মনে করতেন যুদ্ধ অভিপ্রেত না হলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা অপরিহার্য। অরির অপকার করা বা তার প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণকেই বিগ্রহ বলা হয়। কৌকটিল্য মনে করতেন বিজিগীষু যখন নিশ্চিন্ত হবেন যে শত্রু অপেক্ষা তার ক্ষমতা বেশী এবং যুদ্ধ করলে তিনি জিতবেন সেক্ষেত্রে তিনি বিগ্রহ বা যুদ্ধে আগ্রহী হবেন। মূলতঃ বিগ্রহের যে কারণগুলি কৌটিল্যের বর্ণনায় পাওয়া যায় সেগুলি হল—আত্মরক্ষার প্রয়োজন, রাজ্য বিস্তারের বাসনা, শক্তির ভারসাম্য রক্ষার্থে, নিগৃহীত জনগণকে উদ্ধার করতে, আক্রমণের প্রতিশোধার্থে।

এক্ষেত্রে কৌটিল্যের বিহিগীষু রাজার প্রতি পরামর্শ ছিল যে তিনি যেন প্রথমে শাস্ত্রমতে যুদ্ধ করেন। কিন্তু যখন সেই পথে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না তখন যে কোন পথ অবলম্বন করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। দিনের বেলায় নির্দিষ্ট স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাকে **প্রকাশযুদ্ধ** বলে। অন্যদিকে ভয় প্রদর্শন করে, শত্রুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে শত্রুসৈন্যকে উৎকোছ প্রদান করে যে যুদ্ধ তাকে **কূটযুদ্ধ** বলা হয়। এক্ষেত্রে যেকোন সময়ে এবং যেকোন পরিস্থিতিতে আক্রমণ করা যেতে পারে। যেমন বর্তমান সময়ের **গেরিলা যুদ্ধ** এর উদাহরণ।

তবে যুদ্ধ শুরু হবার আগে রাজা নিজের ও শত্রুপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতা বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার করবেন। তার নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে অন্য রাজার সাথে মিত্রতা স্থাপন করবেন। যুদ্ধ করার জন্য সর্বদা অনুকূল পরিস্থিতির অপেক্ষা করতে হবে। যখন দেখা যাবে শত্রুপক্ষ বহু সমস্যায় জর্জরিত, জনগণ অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দেশে মহামারী, খাদ্যসঙ্কট, বন্যা, অগ্নি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঠিক সেই সময়েই বিহিগীষু রাজার উচিত শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা। তবে আধুনিক কালের মতোই যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেই যুদ্ধ অভিযান শুরু করতে হবে।

যুদ্ধের ফলে শত্রুরাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তার প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করে, নাগরিকদের বন্দী করে, শস্যধারগুলিকে ভস্মীভূত করতে হবে। আধুনিককালেও আমরা দেখি বিশেষতঃ বিশ্বযুদ্ধগুলিতে কিবাবে আক্রান্ত দেশগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তাদের খাদ্যব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, কিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। কৌটিল্য পরিখার মধ্যে থেকে যুদ্ধ অর্থাৎ নিম্নযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ ও আকাশযুদ্ধের কথাও উল্লেখ করেছেন যা বর্তমান যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ষাড়গুণ্যের তৃতীয় গুণ হল :

যান (Preparedness to March) : নিজের শক্তিবৃদ্ধি ও উপযুক্ত সময় সুযোগ বুঝে শত্রুরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করাই যান নামে পরিচিত। বিহিগীষু যদি মনে করেন যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শত্রুর বিনাশের হেতু হতে পারে এবং তার মাধ্যমে নিজের রক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় যান অনুসরণ করেন অর্থাৎ যুদ্ধে আগ্রহী হবেন। বিগ্রহের বর্ণনার সময়ই উল্লেখ করা হয়েছে যে শত্রুর দুর্বলতার সদ্ব্যবহার করেই বিহিগীষু রাজা যান অনুসরণ করেন। একা যদি যান সম্ভব না হয় তখন তিনি অমান্য রাজাদের সমবেত করে যানে প্রবৃত্ত হন। নানাপ্রকার যানের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে। যেমন : সন্ধানজ, পার্ষিতগ্রাহ, মিত্র বিগ্রহিণী, দণ্ডজ, নির্ব্যজ, কুল্য, শীঘ্রগামিনী ইত্যাদি।

আসন (Neutrality) : সন্ধি বা বিগ্রহ কোন কিছুতেই প্রবৃত্ত না হওয়াকেই আসন বলা হয়। যখন বিজিগীষু বোঝেন যে তিনি শত্রুকে বা শত্রু তাকে পরাস্ত করতে পারবে না তখন শত্রুকে উপেক্ষা করাই হল আসন। ডঃ ভারতী মুখার্জীর মতে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের Immunity of non-Combatants from belligerent attack নিয়মটি আসনের মতো। কৌটিল্য দশ রকমের আসনের কথা বলেছেন, সেগুলি হল যথাক্রমে : স্বস্থান, উপেক্ষা, মার্গরোধ, দুর্গমাধ্য, রাষ্ট্র বিকরণ, রমণীয়, নিকটাসন, দুর্গমার্গ, প্রলোপাসন, পরাধীন।

দ্বৈধীভাব (Dual Policy) : বলবান এক শত্রুর সঙ্গে সন্ধি ও অন্য শত্রুর সঙ্গে বিগ্রহ বা বাক্য দ্বারা সন্ধি অথচ অন্তরে শত্রুতাকেই দ্বৈধীভাব বলা হয়। কৌটিল্যের মতে এক প্রতিবেশী রাজার সাথে যুক্ত হয়ে অপর প্রতিবেশী রাজাকে আক্রমণ করাই হয় দ্বৈধীভাব। এই গুণটি কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

সংশয় (Seeking Protection) : এটি একটি সাময়িক নীতি বা কৌশল, কোন সমাধান নয়। শক্তিশালী রাজার কাজে নিজের স্ত্রী-পুত্র বা দ্রব্যাদী অর্পণ করে বা নিজে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করা। যদি বিহিগীষু মনে করেন তিনি শত্রুকে বিনাশ করতে সক্ষম নন তখন তিনি সংশয় অবলম্বন করেন। সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি পরিবর্তিত হয়।

এই ছয় রকম গুণ নানাভাবে যুক্ত হয়ে তৈরী হয় ব্যায়াম ও শম। **ব্যায়াম বা Industry** বলতে বোঝান হয় যে কাজ গ্রহণ করা হয়েছে তার ফল লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা অনুসন্ধান করার চেষ্টা। আর **শম বা Peace** যে কাজ গৃহীত হয়েছে তার ফল ভোগ করার জন্য সব বাধাবিঘ্ন নাশ করার প্রচেষ্টা। এই ব্যায়াম ও শমের উপলব্ধিই যে কোন রাজার কূটনীতি চর্চার উদ্দেশ্য। কূটনীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করলেই ব্যায়াম ও শম প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়। তবে কৌটিল্য আবার বলেছেন শুধউ বুদ্ধির মাধ্যমে ষাড়গুণ্য নীতি প্রয়োগ করলেই কূটনীতি সফল হয় না, তার সাথে সংযুক্ত হয় দৈবদুর্বিপাক। এখানে দৈব কর্ম বলতে একদিকে তিনি ঈপ্সিত ফল লাভের উদ্দেশ্যে পূজাঅর্চনা, যাগযজ্ঞ করা, অদৃষ্ট সহায় প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন অন্যদিকে আবার মনুষ্যকৃত অন্যায় অধর্মের ফলে অদৃষ্টের বিরূপতাকেও বুঝিয়েছেন। কাজেই তিনি বুঝেছিলেন মানুষের জীবনকে দৈবকর্ম ও মনুষ্যকর্ম উভয়েই নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌটিল্য পররাষ্ট্রনীতিতে এমনকি অন্তঃরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রেও কূটনীতির পরিচালনার চারটি উপায়ের পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলি হল যথাক্রমে :

সাম (Conciliation) : বিজিত রাজার প্রতি জয়ী রাজাকে এই সাম পদ্ধতি প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। পরাজিত রাজার থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ আনুগত্য পাওয়ার জন্য বিজয়ী রাজার যুক্তিনিষ্ঠ, সুনম্র, মিষ্ট ব্যবহার প্রয়োজন, তেমনি বিজিতের রাজ্যের গ্রাম, বনানী, পথঘাট, যানবাহন জীবজন্তুর সুরক্ষা ও নির্বাসিতদের পুনঃস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়াও আবশ্যক। এর ফলে পরাজিত রাজা বিজয়ীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, কৃতজ্ঞতাবদ্ধ ও অনুগত থাকে।

দান (Gift) : সাম পদ্ধতি প্রয়োগ করে যথোপযুক্ত ফল না পেলে দান পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। এই দানের ফলে ভূমিদান, কন্যাদান, দ্রব্যদান, আয়দান ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্বল প্রতিপক্ষ বা অসন্তুষ্ট প্রজাদের স্বপক্ষে আনা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা সেলুকাস কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের, যোধাবাঈয়ের সাথে আকবরের বিবাহের উল্লেখ করা যায়।

ভেদ (Rupture) : এই পদ্ধতি বলবান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। শত্রুরাজার কোন অবরুদ্ধ পুত্র, জ্ঞাতি, সামন্তরাজা, অরণ্যচারী আটবিকদের মধ্যে একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে সান দান দিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে শত্রুরাজ্যের সহেগ বিভেদ সৃষ্টি করাই হল ভেদ পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতে রাজনীতিবিদগণ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সাম-দান-ভেদ পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগিতা অনুভব করেছিলেন।

দণ্ড (Force) : এখানে দণ্ড বলতে সশস্ত্রে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে না। পূর্বের উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ এগুলি প্রয়োগ করে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে 'দণ্ড' পদ্ধতি প্রযোজ্য। একে শক্তি প্রয়োগের চরম হুমকিও বলা হয়। কৌটিল্য এক্ষেত্রে কূটযুদ্ধ, বিষ প্রয়োগ, গুপ্তচর নিয়োগের কথাও বলেছেন। শত্রুরাজার ওপর প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা নীতিগত চাপ প্রয়োগকে দণ্ড বলা হয়। দণ্ডের চূড়ান্ত ফল হল যুদ্ধ।

এই চারটি পদ্ধতি ছাড়াও উপেক্ষা বা উদাসীনতা প্রদর্শন, মায়া ও ইন্দ্রজালের মত কয়েকটি উপপদ্ধতির কথাও কৌটিল্য বলেছেন যা অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য কূটনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। কোটিল্য উদাসীনের মনোভাবের প্রকারভেদ হিসেবে উপেক্ষার আলোচনা করেছেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি কখনই নিরপেক্ষ শক্তিকে আক্রমণ করে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ড এধরনের নিরপেক্ষ শক্তি বলে পরিচিত ছিল। কৌটিল্য পরামর্শ দিয়েছেন দুর্বল রাজা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে উভয় যুদ্ধরত পক্ষের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে। এভাবেই শক্তিশালী পক্ষগুলি থেকে নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব। মায়া হল একপ্রকার নিকৃষ্ট কূটনীতি। ছলনা ও প্রতারণা এর মূলঅস্ত্র। কূটযুদ্ধে এই ছলনা ও প্রতারণার ব্যবহার হয়। শত্রুকে কৌশলে বিভ্রান্ত করার নাম ইন্দ্রজাল।

পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক দৌত্যের গুরুত্ব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সমাজে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্মানজনক অবস্থানও অনস্বীকার্য। যেমন মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের হয়ে এধরনের দৌত্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অর্থশাস্ত্রে এদের দূত রূপে অভিহিত করা হয়েছে। কৌটিল্যের লেখায় তিন ধরনের কূটনৈতিক প্রতিনিধির উল্লেখ আছে। যথা—

(১) নিসৃষ্টার্থ (Charge d'affairs) : সবরকম অমাত্যের গুণযুক্ত এই দূত পররাষ্ট্র সম্পর্কিত সব ধরনের আলোচনার অধিকারী।

(২) পরিমিতার্থ (Agent) : যে দূত অমাত্যের গুণাবলীর থেকে এক-চতুর্থাংশ কম গুণসম্পন্ন এবং যাদের বিশেষ উদ্দেশ্যে অ্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয় এবং এরা রাজার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না।

(৩) শাসনহর (Conveyer of Royal Writs) : এই দূত কেবল রাজার পাঠানো বার্তা বহন করে নিয়ে যান এবং অন্য রাষ্ট্রের প্রত্যুত্তর স্বদেশে নিয়ে আসেন। সাধারণতঃ অমাত্যের অর্ধেক গুণসম্পন্ন দূতই শাসনহর হিসেবে নিযুক্ত হয়।

নিজের রাজ্যের সিদ্ধান্ত অন্য রাজ্যের শাসকের কাছে ব্যাখ্যা করা, অন্য রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের সঙ্গে মিত্রতা তৈরী করে সেই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা, পররাষ্ট্র চুক্তি কার্যকর করা, শত্রু রাষ্ট্রে বিভেদ সৃষ্টি করা, প্রজাদের মানসিকতা, জনপদ, কোন প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া ও শত্রুর সঠিক শক্তি পরিমাপ করে গুপ্ত সংকেতের মাধ্যমে রাজাকে জানানোই হল এইসব কূটনৈতিক প্রতিনিধির কাজ। এদের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে বিজিগীষু রাজা ষাড়গুণ্যের সঠিক নীতি অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন। এই কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা দূতদের বলা হোত 'রাজার চোখ'। প্রাচীনকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত উন্নত ছিল না বলে পররাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনার কাজে দূতদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও এ গুপ্তচর ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ CIA, KGB, ISI ইত্যাদি গুপ্তচর ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গুপ্তচর ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে কৌটিল্য নিজেকে কঠোর বাস্তববাদী ও বিচরণ হিসেবে পরিচিত করেছেন। এজন্য দূত হবে সদ্ববংশজাত, রাজানুগত, কর্মকুশল, স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, সুপুরুষ, সুবক্তা ও নির্ভীক। প্রয়োজনে বুদ্ধিমান ছাত্র, সন্ন্যাস বেশধারী বিজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, দরিদ্র কিন্তু বুদ্ধিমান কৃষক, বৌদ্ধ, জৈন ভিক্ষুক, জ্যোতিষী প্রভৃতি, বুদ্ধিমতী বিধবা নারীকেও চরবৃত্তিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।

উপসংহার :

আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের কূটনীতির তত্ত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত। বিহিগীষু রাজার রাজ্য জয় ও বিজিত রাজ্যের স্থিতিই ছিল তার কূটনৈতিক তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। অর্থশাস্ত্রে মণ্ডলতত্ত্ব, চতুঃউপায়, মায়া, ইন্দ্রজাল, উপেক্ষা প্রভৃতি উপপদ্ধতি।কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের গুরুত্ব, গুপ্তচর ব্যবস্থা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া আচে যার প্রসাঙ্গিকতা আজও বর্তমান। আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি সেইসব নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন যা বিজিগীষুর পার্থিক স্বার্থ সিদ্ধ করবে।

কৌটিল্য বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার উপায় আরও রাজ্য জয়ও রাজ্য রক্ষা। এই পথে যতদূর পর্যন্ত ধর্ম ও নৈতিকতা বিহিগীষুর স্বার্থরক্ষা করে ততদূর এগুলি অনুসরণ করা যায় কিন্তু তা যদি বিহিগীষু স্বার্থের বিরোধী হয় তখন যেন তেন প্রকারেণ অভীষ্ঠ লাভ করার উপদেশ তিনি দিয়েছেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি ধর্মকে ব্যবহার করতে পিছপা হননি। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় দেবপ্রতিমার অভ্যন্তরে অস্ত্র রেখে তার মাধ্যমে শত্রুরাজাকে হত্যা, ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী শত্রুরাজাকে গুপ্তচরের মাধ্যমে নিধন ইত্যাদি। অর্থাৎ কৌটিল্যের মতে বিজিগীষু রাজার একমাত্র কর্তব্য হল যুদ্ধ ও বিজয়প্রাপ্তি। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার ক্ষেত্রে ধর্মনীতি প্রতিবন্ধক হলে তিনি তা মানতে নারাজ, তাই তার আন্তঃরাষ্ট্র নীতি ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক উপযোগিতাভিত্তিক।

আর এই বাস্তবাদীতা, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রবক্তা হিসেবে অনেকেই কৌটিল্যকে মধ্যযুগের নিকোলো মেকিয়াভেলীর সাথে তুলনা করেন। কৌটিল্য মেকিভেলীর পূর্বসূরী ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের আবির্ভাব অন্যদিকে ষোড়শ শতকে ইটালীতে মেকিয়াভেলীর রাজনীতি চর্চা। তা সত্ত্বেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কৌটিল্যের সময়কালীন ভারত যখন আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর খণ্ডবিখণ্ড ঠিক তখনই অর্থশাস্ত্র রচনার প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। অন্যদিকে মেকিয়াভেলীর সময় ইটালীও বহিঃশত্রু ও অভ্যন্তর শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত। সেই প্রেক্ষিতে রচিত হয় 'প্রিন্স' ও 'ডিসকোর্সেস'। উভয়ের বিশ্বাস করতেন একমাত্র শক্তিশালী রাজাই সবরকম বৈপরীত্য জয় করে রাজনৈতিক ঐক্য আনতে পারে। তাই উভয়েই শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সমর্থক। উভয়েই সামরিক সম্প্রসারণ নীতিতে বিশ্বাসী।

কৌটিল্যের মত মেকিয়াভেলীও বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রনীতিতে ছল, প্রবঞ্চনা, কৌশল, মিথ্যাচারিতা, শঠতা, হিংসা, রক্তপাত, হত্যা কোনকিছুই অসম্ভব নয়। রাজা যেমন সিংহের মত বীর হবেন তেমন শৃগালের মতো ধূর্তও হবেন নাহলে রাজ্যজয় ও রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব না। কৌটিল্যের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, তীক্ষ্ণ বাস্তবমুখীতা, ধর্ম ও নৈতিকতা নিরপেক্ষ প্রয়োজনভিত্তিক রাজনীতি সঙ্গে মেকিয়াভেলীর তুলনা করে অনেকে কৌটিল্যকে প্রাচ্যের মেকিয়াভেলী বলে অভিহিত করেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাঁর মধ্যে কূটনীতি বা আন্তঃরাষ্ট্র সম্পকীয় তত্ত্ব কৌটিল্যকে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা যায়, কৌটিল্যের ধ্যানধারণার সব থেকে বাস্তব প্রকাশ তাঁর কূটনীতি সংক্রান্ত আলোচনাতেই পাওয়া যায়। কৌটিল্যকে অনেকে ভারতের কূটনীতি চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে অভিহিত করেন। কারণ, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কৌটিল্য যে বাস্তবসমন্বিত রাজনীতিচর্চার কথা বলে গেছেন তা আজও ভীষণভাবে প্রসাঙ্গিক।

কৌটিল্য এমন একটি বিশাল সুসংহত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা ইতিপূর্বে বিশ্বের কোথাও দেখা যায়নি। তাঁর সময়কার গ্রীক রাষ্ট্র ছিল নগরকেন্দ্রিক, ক্ষুদ্র ও গণ্ডীবদ্ধ। মিশর বা মধ্যএশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থাও মৌর্য রাষ্ট্রের মতো ব্যাপকতা লাভ করেনি। বিশ্বের রাজনৈতিক চর্চার ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম বৃহৎ রাষ্ট্রের তত্ত্বকার এবং তারই সুচারু নির্মোহ বহিঃপ্রকাশ হল তাঁর রচিত 'অর্থশাস্ত্র'।

৬.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) কৌটিল্যের মণ্ডলতত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

খ) ষাড়গুণ্য তত্ত্বে উল্লিখিত দুটি গুণ কি কি?

গ) কৌটিল্যের কূটনীতি পরিচালনায় চারটি উপায়ের উল্লেখ কর।

ঘ) কৌটিল্য বর্ণিত কূটনেতিক প্রতিনিওিধ কয়প্রকার?

ঙ) কৌটিল্যকে কেন অনেকে প্রাচ্যের মেকিয়াভেলী বলে উল্লেখ করেন?

৬.৫ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Ghosal, U. N. (1959). *A History of Indian Political Ideas: The Ancient Period and The Period of Transition to the Middle Ages.* Bombay: Oxford University Press.

ii. Singh, G. P. (1993). *Political Thought in Ancient India.* New Delhi: D. K. Print World Ltd.

iii. Varma, V. P. (1986). *Ancient and Medieval Indian Political Thought.* Agra : Lakshmi Narain Agarwal.

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-7

ভারতে ইসলামীয় যুগের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের বৈপরীত্যমূলক মতাদর্শ (Politics of Islamic Paradox: Constrasting views of Kingship)

বিষয়সূচি :

৭.১ পাঠ-উদ্দেশ্য
৭.২ ভূমিকা
৭.৩ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম রাষ্ট্র শাসন ও প্রশাসনের চিত্র
৭.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
৭.৫ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে ভারতে ইসলামীয় যুগের রাজতন্ত্রের মতাদর্শগত বৈপরীত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী ধারনা লাভ করতে পারবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী মধ্যযুগের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম রাষ্ট্র শাসন ও প্রশাসন থেকে মুঘল যুগের রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত ধারণা অর্জন করতে পারবে।

৭.২ ভূমিকা

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় তিনশো বছর ধরে বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্খী রাজা ও রাজবংশের (চৌহান, চালুক্য, পারমার, কনৌজ প্রতিহার প্রভৃতি) উত্থান পতনেও ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক জীবনে যে অস্থিরতার সূচনা হয় তার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র রাজনীতির ক্ষেত্রে এক পট পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যেই সুদূর আরবে ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং তা ধীরে ধীরে আরব থেকে উত্তর আফ্রিকায় এবং কালক্রমে ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়।

প্রাথমিকভাবে ধনরত্ন লুণ্ঠনই উদ্দেশ্য হলেও শেষ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটে। গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন দশম শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর পশ্চিম ভারতে একাংশ অধিকার করেন এবং তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ গগ ভারত আক্রমণ করে ভারতের ধনরত্ন সংস্কৃতি সভ্যতাকে নির্বিচারে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। সম্ভবত এই সময় থেকেই ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রবেশাধিকার ঘটে। সুলতান মামুদের আমলেই পশ্চিম পাঞ্জাব গজনাবিদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে সুলতান মামুদ নন, ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মূল কৃতিত্ব তুর্কি রাজা মহম্মদ ঘোরীর। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) রাজপুতদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী মুসলমান রাজ্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটান মহম্মদ ঘুরী, তুর্কিদের হাত ধরেই ভারতবর্ষে পরিবর্তীকালে ছশো বছরের ইতিহাসে যে মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে তার দুটি পর্যায় চিহ্নিত করা যায়—প্রথমটি হল দিল্লি সুলতানদের শাসন (১২১১-১৫২৬) এবং দ্বিতীয়টি মুঘল রাজবংশের শাসন (১৫২৬-১৮৫৮)। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তা

বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা হল মুসলিম ধর্মীয় ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত রাষ্ট্র চিন্তা। ইসলামের অভ্যুত্থান ভারতে এক নতুন পরিস্থিতির সূচনা করে। মুসলমানরা ভারতে আসার আগে যে সব উপজাতি গোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করেছে তারা একরকম ভারতীয় সমাজ ও জনজীবনের সঙ্গেই মিশে গেছে। কিন্তু মুসলমানরা এইসব উপজাতি গোষ্ঠীর মতো এদেশের সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি। তারা তাদের সঙ্গে এনেছে এক সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধর্ম, ইসলাম। একই সঙ্গে তারা গভীর যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে তাদের মূল ধর্মীয় ভূখণ্ড আরব দুনিয়ার সঙ্গে। ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়র মুসলমানদের যোগাযোগ অক্ষুন্ন থেকেছে এবং ইসলাম প্রভাবিত অঞ্চলগুলির চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির প্রভাবও ভারত ভূমির উপর বিশেষভাবে পড়েছে।

৭.৩ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম রাষ্ট্র শাসন ও প্রশাসনের চিত্র

অষ্টম থেকে অষ্টাদশ এই এক হাজার বছরের অধিক সময় ধরে ভারতবর্ষে মুসলিম রাষ্ট্র শাসন ও প্রশাসনের যে ধারার সূচনা ও বিকাশ ঘটেছিল ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে তা একান্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ।

(ক) প্রাথমিকভাবে আরব্যের ইসলামিক বিধানের মধ্য দিয়ে মুসলমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণাগুলি লাভ করা যায়। আরব্য ধর্মপ্রচারক (হজরত মহম্মদ) প্রচার করেছেন একই ঈশ্বরের আদর্শ, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, শোষণহীন ও সাম্যের আদর্শে পরিচালিত এক সমাজ ও শাসনের আদর্শ, অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার কাটিয়ে শিক্ষা প্রচারের এক কর্মসূচির আদর্শ, কর্মে ও দায়িত্বশীলতায় মানুষ গড়ার এক উদ্যোগ, ভবিষ্যৎ সমাজ ও জাতি গঠনের এক সংকল্প। সন্দেহ নেই মহম্মদ যে আদর্শ সমাজ শাসন ও মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, মানবতার যে বাণী প্রচার করেছিলেন, পরবর্তীকালের মুসলিম নেতৃত্ব সেই আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা রাখতে পারে নি। ধর্মপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে সাম্রাজ্য শাসন ও লুণ্ঠনের নীতিতে আস্থা রাখেন কিছু পরবর্তী নেতৃত্ব ও শাসক। দু একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, ভবিষ্যতের মুসলিম রাষ্ট্র ও শাসন ধর্ম প্রচারক প্রবর্তিত আদর্শ ও শাসনকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মুসলিম শাসনের মানবিক ও সামাজিক শৃঙ্খলার প্রাথমিক বিচ্যুতি দেখা যায় তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতার মধ্যে। এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন আরব থেকে সিরিয়াতে, প্যালেস্টাইনে, মিশরে, পারস্যে ও পৃথিবীর নানা অংশে বিস্তার লাভ করে অবশেষে ভারতে প্রসারিত হয়। লক্ষ্যণীয় অন্যান্য অংশে মুসলিমদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা প্রতিহত হলেও কোন কোন অংশে মুসলিম আধিপত্য খর্ব বা বিন্যাস হলেও ভারতে কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে মুসলিম ক্ষমতা ও আধিপত্য বজায় ছিল। এই আধিপত্য খর্বের তেমন একটা সংগঠিত প্রচেষ্টা এদেশে লক্ষ্য করা যায়নি। সম্ভবত তার একটি কারণ ভারতবর্ষে মুসলমানরা ধীরে ধীরে সমাজ ও শাসনের মূল গতি বা ধারার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিতে প্রয়াসী হয়। তবে ক্রমে ক্রমে মুসলিম শাসক নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় হয় এবং এক সময় অপর একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে পরাজিত হয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়।

আরবদের সিন্ধু আক্রমণ :

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যায় আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণের সূত্রে। আরবদের সিন্ধু আক্রমণের পেছনে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা তেমন ছিল না। ধনরত্ন লুণ্ঠনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক লালসা মেটানোই ছিল তাদের লক্ষ্য। উমাইয়া খলিফারা (৬৬১-৭৫০ অব্দ) গড়ে তুলেছিলেন পৃথিবীব্যাপী এক রাজবংশীয় শাসন। এই শাসন রাজবংশীয় হলেও দায়িত্বশীল ছিল। ইসলাম শরিয়তের প্রতি আনুগত্য এবং মক্কা ও মদিনাবাসীর সুখ ও কল্যাণের প্রতি আন্তরিক হলেও এই সময় থেকে আরব শাসকদের সাম্রাজ্য ক্ষুধা প্রবল হতে থাকে। রোমানদের মতই পররাজ্য গ্রাস করার প্রবণতা আরবদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বেই পারস্যে, সিরিয়াতে, মিশরে আরবরা অভিযান চালায় ও সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

এই খলিফাদের শাসনকালেই ইরাকের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন হজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফি। আরব এবং ইরাকে বিদ্রোহ দমনের সাফল্য তাঁকে অচিরেই সমগ্র পারস্যের অধিপতি হতে সাহায্য করে। রাজ্য শাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসে ইসলামের প্রতি আনুগত্য বা ধর্মীয় অন্যশাসনকে তিনি বাধা মনে করেননি। প্রতিপক্ষকে দমন করতে নিষ্ঠুর আর্থিক দণ্ডদান (জিজিয়া) ও হত্যাকান্ডে তাঁর দ্বিধা ছিল না। হজ্জাজ উচ্চশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধাকে সম্মান জানিয়েছেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ও অভিজাত স্বার্থের সংরক্ষক। এই স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদেই তিনি সিন্ধুদেশ অভিযানের পরিকল্পনা করেন। সিন্ধুদেশের শাসককে মধ্যস্থতা ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়ে, এই অঞ্চল থেকে সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে হজ্জাজ প্রতিশোধের ইচ্ছায় তার সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধুদেশ দখল ও লুণ্ঠনের কাজে নিয়োগ করেন।

হজ্জাজের উগ্রসাম্রাজ্যবাদের বলি হয় সিন্ধুপ্রদেশের শাসক, প্রজা এবং তাদের ধর্ম ও সমাজ। মহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধদেশ জয় করে সেখানে যে শাসন নীতি গ্রহণ করেন তা উল্লেখযোগ্য। সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের হত্যাকান্ড, ৬০০০ দুর্গবাসীর হত্যা হিন্দু নারীদের আত্মবিসর্জন এবং মহম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মূলতান অধিকার ইতিহাসের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হলেও মহম্মদ বিন কাসিমের স্বল্পকালীন শাসনের রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। আরব সেনাপতি এদেশের ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের আবেগকে ব্যবহার করেন। নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজাদের কাছে সুরক্ষার বিনিময়ে তিনি দাবি করেন আনুগত্য। এদের দারিদ্র্য, অসহায়তা ও ক্ষুদ্র ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করেন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায়। এই অভিযান অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। আরব নেতৃত্বের বিরোধ, আরব ও সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে সংযোগের অভাব, আরব দেশে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের সংকট, রাজপুত, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি কারণে এই অভিযান স্থায়িত্ব পায়নি। তবে হিন্দুরাষ্ট্রে মহম্মদ কাসিম যে ধর্ম নিরপেক্ষ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, হিন্দু জনশক্তির সাহায্য ও আনুকূল্য লাভ করেছেন, শাসনের যে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী কালে একমাত্র আকবর ছাড়া অন্য কোন শাসক তা পারেননি। অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব এই মন্তব্য করেছেন।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ ও শাসন :

দশম শতাব্দীর শেষার্ধ ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতে অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রিক সংহতির অভাব ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসক ও সাম্রাজ্যবাদের এক উন্মুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করে। এই পর্যায়ে মুসলিম দুনিয়া রাজনৈতিক বিবাদের কারণে চরম সংকটে পড়ে। আরবদেশে খলিফাদের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। এই অস্থির পরিস্থিতিতেই খোরাসানের শাসক আলপ্তগীন আফগানিস্থানের গজনী রাজাকে কেন্দ্র করে ভারতে ক্ষমতার এক স্থায়ী আসন স্থাপন করতে উদ্যোগী হন আলপ্তগীনের প্রচেষ্টা সফল হয় তার জামাতা সবুক্তিগীনের গজনী রাজ্য অধিকার এবং ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহি বংশীয় রাজা জয়পালকে পরাজিত করে লবুক্তিগীন ও তার পুত্র মামুদ গজনী অতিক্রম করে সাম্রাজ্য বিস্তারের সচেষ্ট হলেন। সবুক্তিগীনের পুত্র সুলতান মামুদের উচ্চাকাঙ্খী কূটকৌশল ও রণনৈপুণ্যের জোরে অচিরেই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের এক ঐতিহাসিক পর্বের সূচনা হল। স্বল্পকালের জন্য হলেও ভারতে সুলতান মামুদ যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যুদ্ধ ও ভীতির যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন তা রীতিমতো বিস্ময়কার।

মামুদ ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিদিন সুলতান উপাধি রাখেন মুসলিম খলিফাদের কাছে তার আনুগত্যের প্রকাশ হিসেবে। কর্তব্য হিসেবে তিনি বেছে নেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধের সংস্কারকে। এই ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনাকে তিনি কার্যকর করেন ১৭ বার ভারত আক্রমণ, মন্দির ধ্বংস, অবাধ লুণ্ঠনের মাধ্যমে প্রথমে সীমান্ত দূর্গ তার পর একে একে পেশোয়ার ভীরা, মুলতান, সুখপাল নাগরকাট, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, অস্নিত সারয়া, গোয়ালিয়র, কালাঞ্জোর অধিকার করে মামুদ তাঁর সামরিক ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান :

গজনীর সুলতান মামুদের উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা ও সমকালের হিন্দু রাজাদের আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন এক অজনা উপজাতীয় মহম্মদ ঘুরী। জ্যেষ্ঠভ্রাতা গিয়াসুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ (শিহাবুদ্দিন) ঘুরী ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারত আক্রমণ ও আধিকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ভারতে দীর্ঘসময়ে জন্য মুসলিম আধিপত্যের এক ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের রাজনৈতিক তাৎপর্য হল পারস্য রেনেসাঁর ইতিবাচক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য যা সুলতান মামুদের আমলে বর্জিত হয়েছিল তাকে স্থাপন করা। মূলতান, গুজরাট, পঞ্জাব, লাহোর, কনৌজ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান অধিকার করে ভারতে তুর্কি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মূল কৃতিত্ব অবশ্যই মহম্মদ ঘুরীর।

দিল্লী সুলতানী শাসন :

দিল্লী সুলতানী শাসনের তিনটি পর্ব রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। **প্রথমপর্ব :** দাস বংশের শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি দীর্ঘ সময় (১২০৬-১২৯০) তুর্কি দাস নামে পরিচিত, রণ-নিপুন, দক্ষ আমলাদের শাসন এই শাসনের সূচনাকালের দুই বিশিষ্ট সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিস এবং শেষ পর্যায়ের সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন।

কুতুবদ্দিন আইবক তাঁর যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রাখলে ও দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠি করতে পারলেও, সুলতানী শাসনের কোন ধারাবাহিক নীতি স্থাপন করতে পারেন নি। উদারতা বা ইসলাম ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা রেখে, সমাজ সংস্কার ও দানধর্মে নিয়োজিত থেকে ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতি পেলেও, রাজনৈতিক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সফল হন নি। ইলতুৎমিসের সময়ে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের ভারত আক্রমণের সূত্রে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সুলতানী শাসন সাময়িক কালের জন্য দুর্বল হয়। তবে ইলতুৎমিসের সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ফলে অচিরেই এই সংকট কেটে গেছে। ইসলামের প্রতি অনুরাগ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা, শাসন সংস্কার ইত্যাদি গুণের দ্বারা ইলতুৎমিস নিজেকে ভারতের প্রথম সাবভৌম সুলতান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইবন বতুতী ইলতুৎমিসকেই মুসলিম ভারতবর্ষের সার্বভৌম সুলতান আখ্যা দিয়েছেন। মুসলিম জগতের একচ্ছত্র নেতা বাগদাদের খলিফার কাছে তিনি 'সুলতান-ই-আজম' সম্মান লাভ করেন।

ইলতুৎমিসের পরবর্তী চারবছর দিল্লীর শাসন ছিল সুলতানা রিজিয়ার পরিচালনাধীনে। সামরিক প্রতিভা ন্যায়পরায়ণতার গুণে বিশিষ্ট হলেও এবং ইসলামের প্রতি অনুগত হলেও তাঁর কঠোর শাসন ও নারীত্ব ক্ষমতাপ্রিয় তুর্কি আমির ও ওমরাহদের পছন্দ ছিল না। তাঁর ক্ষমতাচ্যুতি ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সুলতানী শাসনের সার্বভৌমিকতা আবার বিপন্ন হয়। এই অরাজক অবস্থা থেকে দিল্লী সুলতানী শাসনকে উদ্ধার করেন গিয়াসুদ্দিন বলবন। গিয়াসুদ্দিন দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যের মূল সমস্যা শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন ও অরাজকতা দমন, তুর্কি আমির-ওমরাহদের ষড়যন্ত্র রোধ, মঙ্গল আক্রমণ থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে, অক্লান্তভাবে রাজ্য রক্ষা ও সংস্কারের কাজে ব্রতী থেকে দিল্লী সুলতানী শাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

বলবনের শাসননীতির কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে—(১) গুপ্তচরের মাধ্যমে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা, (২) চল্লিশ ক্রীতদাসের সমিতি গঠন করে আমির-ওমরাহদের প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করার কাজে তাকে ব্যবহার করা, (৩) নিজেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত করা এবং 'জিল্লিলাহ' উপাধি গ্রহণ, (৪) দরবারী আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুলতানী সিংহাসনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা, (৫) সামরিক শক্তিকে সুলতানী রাজত্বের মেরুদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতিদান এবং এই উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ, সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, (৬) সুলতানী শাসনকে কঠোর স্বৈরাচারী শাসন, সুলতান নির্ভর শাসনে পরিণত করা এবং একই সঙ্গে 'রক্ত ও লোহার নীতি' ও দায়িত্বশীলতার নীতিকে প্রয়োগ করা, (৭) গোঁড়া ইসলামী আইনের প্রতি নিষ্ঠা রেখে শাসন পরিচালনা করা।

মধ্যযুগের সুলতানী শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল খলজী বংশের শাসন। দিল্লী সুলতানী শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠার

ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজীর নাম স্মরণীয়। সুলতানী শাসনের সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনাকার হলেন আলাউদ্দিন খলজী। স্থিতাবস্থা রক্ষা নয়, সাম্রাজ্য বিস্তারই ছিল আলাউদ্দিনের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য নিয়ে প্রশাসন, প্রতিরক্ষা নীতিকে তিনি সুদূর করেন। উত্তর ভারত তো বটেই, সমস্ত দাক্ষিণাত্যকে তিনি সুলতানী শাসকের অধীনে আনতে প্রয়াসী হন। আলাউদ্দিন খলজী স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে রাজাকে দৈবিক চরিত্র দান করেন এবং রাজার বিবেক অনুসারে শাসনের নীতিকে সমর্থন করেন। স্বাধীন নীতি নিয়ে রাজ্য শাসন কালেও ইসলামের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। গুপ্তচরদের মাধ্যমে ওমরাহদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক নজর, ওমরাহদের বাড়তি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ওমরাহদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তিনি তাঁর একচ্ছত্র শাসনের প্রধান বাধা ওমরাহদের প্রতিপত্তি ও বিদ্রোহকে দমন করতে চান। সামরিক সংগঠনকে শক্তিশালী করা, সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত কর্মীদের সুবিধা দান, জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তাদের উপর কর স্থাপন, হিন্দু প্রজাদের নানাভাবে আর্থিক শোষণ, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ও বৃত্তির উপর লাইসেন্স নীতি, সৈন্যদের স্বার্থে দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি আলাউদ্দিনের শাসন নীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ছিল।

জিয়াউদ্দিন বরনী আলাউদ্দিনের রাজ্যশাসন নীতির কঠিন সমালোচনা করেছেন এবং তুলনা করেছেন মিশরের রক্তপিপাসু ফ্যারাওদের সঙ্গে। বরনীর মতে আলাউদ্দিনের হত্যা, ধ্বংস, জিজিয়া নীতি, উলেমাদের প্রভাব ক্ষুন্ন করার নীতি ইসলাম বিরোধী। ইবন বতুতা, আমীর খসরু অবশ্য বরনীর সঙ্গে একমত নন। তাঁরা আলাউদ্দিনের সাংগঠনিক ও সামরিক নীতির প্রশংসা করেছেন। মুসলিম সাহিত্য, সংস্কৃতির শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

দিল্লী সুলতানী শাসনের এক বিরল নজির মহম্মদ বিন তুঘলক। ঐতিহাসিকের চোখে অস্থির চিত্র ও উন্মাদ রাজা বলে চিহ্নিত হলেও গবেষকের চোখে তিনি পণ্ডিত, সংস্কারক ইসলামের প্রতি অনুগত প্রশাসক, বিশেষজ্ঞ, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী। কারণ মহম্মদ বিন তুঘলক সে যুগে যা কিছু ব্যতিক্রম, বিপরীত ধর্মী তাকেই সম্মান জানান। সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে গভীর চিন্তাশীলতার সংযোগ ঘটান তিনি। অধ্যাপক হাবিব তাঁকে 'Social Justice'-এর অনুরাগী এবং কয়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক মানুষ হিসেবে দেখেছেন। জীবন সংশয় জেনেও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষ করতে তিনি রাজী ছিলেন না। সুলতানী শক্তিকে সংহত করতে উর্দ্ধপদের আমলাদের চেয়ে তিনি বেশি নির্ভর করেছেন নিম্নপদের কর্মচারীদের উপর। তবে মহম্মদের হঠকারিতা, ধৈর্যহীনতা, সন্দিদ্ধচিত্ততা, কাল্পনিক উদ্ভাবনার মাসুল দিয়ে হয়েছে তাঁর কর্মচারী, সৈন্য ও প্রজাদের। সংস্কারবাদী হলেও সংস্কারকে কার্যে পরিণত করার বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় তিনি সব সময় দিতে পারেননি। সংস্কারের অসাফল্য ও বিদ্রোহের কারণে সুলতানী শাসন গভীর সংকটের মুখে পড়ে। প্রগতিশীলতায় উত্তীর্ণ হলেও মহম্মদ বিন তুঘলকের সামরিক ও শাসননীতির দুর্বলতার কারণে দিল্লী সুলতানী শাসনের ভাঙন দেখা দেয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের রীতিনীতি ও খলিফার প্রতি আনুগত্য নিয়ে পরবর্তী কয়েক দশক (১৩৫১-১৩৮৮) দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্ব দান করলেও এবং ইসলামের অনুশাসনে সুলতানী ক্ষমতাকে বৈধ করতে সমর্থ হলেও শাসনের মূল শক্তি গণভিত্তির উপর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি ইসলামের নীতি মেনেই রাজস্বনীতি ও কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, ব্যবসায়ীদের উপর থেকে অতিরিক্ত কর রহিত করেন, প্রজাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার বন্ধ করেন কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, নাগরিক, নিরাপত্তা ও সেবার ব্যবস্থা করেন, কাজীর বিচার চালু করেন, ইসলামীয় ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগী হন একথা সত্য। জিয়াউদ্দিন বরনীর চোখে তিনি ছিলেন আদর্শ মুসলমান রাজা। কৃষি ও কর ব্যবস্থার সংস্কার, জনসেবা ও সংস্কৃতির প্রসার তাঁর মহত্বের পরিচয় হলেও বা দীর্ঘকালের শাসন তাঁর জনপ্রিয়তার নিদর্শন হলেও বা পূর্ববর্তী শাসক মহম্মদ বিন তুঘলকের মতো আবেগ ও হঠকারিতার পথে তিনি অগ্রসর না হলেও, ফিরোজ শাহের শাসন ধর্মসহিষ্ণু, গণতান্ত্রিক ছিল একথা ভাবার কারণ নেই। ফিরোজের ধর্মান্ধতা সুলতানী শাসনের ধ্বংশের পথ প্রশস্ত করে।

দিল্লী সুলতানী শাসনের প্রায় দুই শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাস রাজনৈতিক দিক থেকে বিশিষ্টতা লাভ করেছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত এই সময় ভারতবর্ষে মুসলিম রাষ্ট্র চিন্তার একটি স্পষ্ট ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্রের বৈধতা ও রাজার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে মুসলিম ভাবনা কী সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার প্রসার ঘটে। এই যুগেই রাজতন্ত্র বিষয়ের প্রচলিত মুসলিম ভাবনার বিপরীত চিন্তাও লক্ষ্যণীয়। দ্বিতীয়ত, এই সময়ই মুসলিম রাষ্ট্র শাসন প্রণালী ও প্রবণতাটি লক্ষ্যণীয়। প্রচলিত রাজ্য শাসন প্রণালীর সঙ্গে মুসলিম রাজ্য শাসন পদ্ধতির একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা এই সূত্রেই করা সম্ভব। তৃতীয়ত এই যুগের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতির দিয়ে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের রাষ্ট্র চিন্তার ধারাটিকে চিহ্নিত করা যায়। সুলতানী আমলে রাষ্ট্র শাসনের সাধারণ প্রবণতা ও পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে এই যুগের শাসনের কিছু বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়—

(ক) রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা : ধর্মীয় মত মেনে, রক্ষণশীল ঐতিহ্য মেনে পরিচালিত হয়নি দিল্লীর সুলতানী শাসন। এই যুগে রাজা অর্থাৎ সুলতান নিজেকেই এক প্রতিষ্ঠান করে তুলেছেন তাঁদের একচ্ছত্র ক্ষমতার সূত্রে। ইসলাম নয়, শরিয়ত নয়, রাজার ক্ষমতার বৈধতা রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে, সমাজ শৃঙ্খলা ও স্থিতির স্বার্থে।

(খ) রাষ্ট্রীয় আইনের প্রাধান্য : সুলতানী যুগে রাষ্ট্রীয় আইন হল জাবিতা বা জাওয়াবিদ। জাবিতাই রাজতন্ত্রের ভিত্তি বৈধতার শক্তি, জাবিতার শক্তি নিয়েই চলে প্রশাসন, সামরিক বাহিনী ও বিচার ব্যবস্থা। ইসলাম বা শরিয়তের মূল নীতির বিরোধী জেনেও ইলতুৎমিস, গিয়াসউদ্দিন বলবন রাজ্য শাসনের বৃহত্তর প্রয়োজনে, মুসলিম সমাজ ও শক্তির বৃহত্তর স্বার্থে রাজা আরোপিত এই আইনের স্বপক্ষে সওয়াল করেন। আলাউদ্দিন বুঝে ছিলেন শরিয়তের আইন দিয়ে ধর্মীয় পণ্ডিতদের উপদেশ মেনে চললে বাস্তব রাষ্ট্রকর্ম সম্ভব নয়। কোরানের আদর্শ মেনেই তিনি জনসেবায় ব্রতী হন। ধর্মপ্রচারকের সেবাধর্ম ও দান-ধ্যানের ব্রত তাঁকে উৎসাহিত করেছে দায়িত্বশীল রাজধর্ম পালনে। তবে শুধুমাত্র ভিক্ষার দান নিয়ে জনসেবা চলে না, বা মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না। সুতরাং প্রয়োজন হল অর্থ সংগ্রহ। অর্থ সংগ্রহের জন্যই প্রয়োজন রাজ্য বিস্তার, যুদ্ধ আর উপযুক্ত সেনা ও রাজকর্মচারী। সেনা সংগঠন আমলা নিয়োগ , জনসেবা, শিক্ষা, সংস্কার সব কিছুর ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে রাজার চাই নিজস্ব ক্ষমতা—আইনি ক্ষমতা।

(গ) রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর : সুলতানী শাসনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল রাজার পরিষদ, আদালত, মন্ত্রনালয় এ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর। সুলতানের পরিষদ (Imperial Council) রোমের সম্রাটদের পরিষদের আদলেই গড়ে উঠেছে। পরিষদ অর্থাৎ মজলিস-ই-আম' এ থাকতেন রাজার একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত কিছু সহকারী পারস্য রাজাদের অনুকরণেই এর নামকরণ কাজকর্ম ইত্যাদি স্থির হয়। সুলতান হলেন চূড়ান্ত শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। নতুন যুগের দাবি ও প্রথা মেনে রাজা তাঁর কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে গঠন করবেন পরিষদ। পরিষদ হল রাজার পরামর্শসভা। এর কোন আইনগত ক্ষমতা নেই। পরিষদের সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা রাজ্যের। সুলতানের আদালত (মজলিস-ই-আম, বার-ই আম) ছিল সে যুগের সভা। রাজসভা ছিল জনসভা। পরিষদের মতো গোপনীয়তা নয়, আদালত বা সভার কাজ ছিল খোলাখুলি আলোচনা দাবি ও অভিযোগ শোনা। নির্ধারিত কর্মসূচির ভিত্তিতে সবার কাজ চলত। সভার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকতেন 'হাজিব' নামক কর্মচারী। প্রাসাদের মেয়র, রাজার রক্ষী, মন্ত্রীবর্গ সভায় থাকতেন। রাজার প্রত্যক্ষ তদারকী ও নির্দেশে সুলতানী আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কাজ চলত। রাজস্ব মন্ত্রী (দেওয়ান-ই-ভিজারত), যুদ্ধমন্ত্রী (দেওয়ানি-ই-আরজ), স্থানীয় কাজকর্ম পরিচালনা বিষয়ক মন্ত্রী (দেওয়ানি-ই-ইন্সা) এবং বাজার মন্ত্রী (দেওয়ানি-ই-রিয়াসৎ) ছিলেন রাজার চার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী।

(ঘ) আমলাতন্ত্র : সুলতানী শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আমলাতান্ত্রিক শাসন। প্রচলিত ইসলামী রীতি মেনে বিভিন্ন পন্ডিত বা উলেমাদের সাহায্য ও পরামর্শ মতো রাজ্য শাসনের রেওয়াজ সুলতানী শাসনে ছিল না। সুলতানী শাসনে আমলাতন্ত্র হল রাজার নেতৃত্বে উদ্ভূত নতুন পরিচালক গোষ্ঠী। গিয়াসউদ্দিন বলবন তুর্কিরবংশজাত মুসলমানদের দিয়েই তাঁর পরিষদ গঠনে আগ্রহী ছিলেন। বংশ কৌলীন্যের নীতিকেই তিনি আমলা নিয়োগে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুলতানী আমলে রাজা নিজেই

কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্তের দায়িত্বে ছিলেন। জিয়াউদ্দিন বরণী সুলতানী আমলে আমলাতান্ত্রিক বিপ্লবের যে গতি লক্ষ্য করেছেন তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল (১) এখানে দাস ও উচ্চবিত্ত উভয় শ্রেণীর মানুষই রাজার প্রয়োজনমতো নিযুক্ত হয়েছেন। ইলতুৎমিস ভারসাম্য বিধানের নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। (২) ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর প্রায় তিরিশ বছর দাসদের নিয়ে গঠিত সভা 'চিহলিগামী' সুলতানী সাম্রাজ্যের উপর তাদের ক্ষমতা বিস্তার করেন। এই যুগে ক্ষমতার উন্মত্ততা ও বিরোধ থেকে সৃষ্টি হয় দীর্ঘকালের এক অরাজকতা। (৩) বলবন তুর্কি অভিজাত গোষ্ঠীর শাসনের ধারা ফিরিয়ে আনলেও আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনে আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবেই রাজার অনুগত এক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। আলাউদ্দিন তাঁর আমলাদের যোগ্যতা ও স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভিত্তিতে এদের সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা দিয়েছেন।

(ঙ) শ্রেণী শাসন : সুলতানী আমলে কঠোর মুসলিম বিধান ও রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে রাজ্য শাসনের এক প্রবণতা গড়ে ওঠে। এই প্রবণতাটি স্পষ্ট হয় রাষ্ট্র শাসনের এক কর্মচারী ব্যবস্থাপনার (working arrangement) মধ্যে। এই ব্যবস্থাপনা হল কেন্দ্রীয় স্তরে মুসলিম রাজার আধিপত্য মেনে নিলে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিন্দু রাজাদের শাসনাধিকার স্বীকৃত হবে। অনেক ক্ষেত্রেই সুলতানের যুদ্ধাভিযানের পর তাঁর মুসলিম আমলা ও স্থানীয় হিন্দু শাসকদের মধ্যে একটি কার্যকরী বোঝাপড়া হয়। এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই স্থানীয় স্তরে হিন্দু প্রধান এবং কেন্দ্রীয় স্তরে সুলতানের নিজ নিজ ভাগ পেতে বা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে অসুবিধা হয়নি। আমির খসরু বিবরণ থেকে জানা যায় আলাউদ্দিন খলজী মঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে মালিক নায়েক নামে জনৈক হিন্দু নেতার নেতৃত্বে ৩০ হাজার হস্তিসেনা প্রেরণ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের বৃহত্তর প্রয়োজনেই উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়। এ বিবরণ জিয়াউদ্দিন বরনীর সূত্রেই লাভ করা যায়।

(চ) মুসলিম রাষ্ট্র শাসন ও কর্মবিভাগের নীতি : সুলতানী আমলে রাষ্ট্র শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অনেকটা প্রাচীন যুগের মনুর ধর্মশাস্ত্র রাষ্ট্র বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রের মতো মধ্যযুগের সুলতানী রাষ্ট্রও প্রতিটি পেশা ও কর্মে নিযুক্ত মানুষ আপন আপন কর্তব্যে স্বনিষ্ঠ থেকে, নিজ দায়িত্বে অটল থেকে সমাজ গঠনের কাজে সাহায্য করুক এটা চেয়েছে। জিয়াউদ্দিন বরনী তাঁর 'ফতোয়া-ই-জাহানদারী' রচনায় কর্ম বিভাগের এই নীতিটির কথা বলেছেন। এই রচনায় তিনি বুদ্ধিজীবী, যোদ্ধা ও সাধারণ কর্মীর কাজ ও দায়িত্বের ভিত্তিতে সমাজের তিনটি কর্মবিভাগের কথা বলেছেন এবং একথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কর্মবিভাগের নীতি অনুসরণ না করলে রাষ্ট্র বা প্রশাসন ভালোভাবে চলতে পারে না। অন্য একটি অংশে তিনি কর্মবিভাগের ভিত্তিতে ছটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। এঁরা হল সৈন্যবাহিনী, কৃষিজীবী, সুদের কারবারী, দোকানদার, ব্যবসায়ী বা বণিক এবং রাজকর্মচারী। প্রতিটি বৃত্তির মানুষ সমাজের স্বার্থেই আপন কর্তব্য পালন করবে।

(ছ) ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র শাসনের প্রবণতা : দিল্লী সুলতানী শাসনের সময়, রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের স্বার্থে শাসক শ্রেণী বা সুলতানী সাম্রাজ্যের স্বার্থ প্রাধান্য পেলেও বা কোন কোন সুলতানের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার নীতি প্রশয় পেলেও রাষ্ট্র পালনের বৃহত্তর প্রয়োজনে এই সময় থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার এক ভাবনা স্পষ্ট হতে থাকে। সুলতানা রাজিয়ার আমলে স্বল্পকালীন শাসন সমাজ সংস্কার ও ধর্মনিরপেক্ষতার একটা প্রবণতা আলাউদ্দিন খলজীর আমল থেকেও লক্ষ্য করা যায়। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল থেকে রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতার এক আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা, হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কার রোধে তৎপরতা (সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি), হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা, সমাজ সংস্কারের নানা পরিকল্পনা মধ্য দিয়ে মহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য ধর্ম নিরপেক্ষকরণের এই প্রচেষ্টা অবশ্য বিশেষ সাফল্য পায় পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের আমলে।

সুলতানী আমলের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন—মানবিক ভাবনা ও হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় :

সুলতানী আমল থেকেই ভারতে মুসলিম চিন্তার মধ্যে একটি উদার, মানবতাবাদী, সংস্কারপন্থী এবং কখনও কখনও আমূল সংস্কারবাদী ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে দার্শনিক ও যুক্তিবাদী চিন্তার এক গভীর সংযোগ ঘটে। ধর্মীয় উদারবাদ এবং মানবিক ও যুক্তিবাদী ভাবনার সমন্বয়ে যে মুসলিম ভক্তিবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকের ভারতবর্ষে ঘটে সেটিই সুফি ভাবধারা নামে পরিচিত। মুসলিম ধর্মীয় আবেগ থাকলেও ধর্মীয় আইনি কঠোরতা ত্যাগ করে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের মূল সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেন এঁরা। সুফি মতবাদীরা যে জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যের পথে যাত্রা করতে চান তার তিনটি স্পষ্ট লক্ষ্য : (ক) পার্থিব চিত্ত বিক্ষেপ চাওয়া-পাওয়ার মোহ ছেড়ে ধ্যান ও আরাধনায় নিজেদের নিয়োগ করা, (খ) ধর্মীয় আবেগের চোখে আত্মশুদ্ধি ও শৃঙ্খলার ধর্মে পরিচালিত হওয় এবং (গ) মানবমুক্তি, ঐক্য, মৈত্রী সেবা ও সংস্কারের কর্মযজ্ঞে ব্রতী হওয়া। ইসলামের বিস্তৃতি ও বিশ্বজনীন ধর্মে রূপান্তরের প্রতিটি পর্যায়ে যে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার, ভ্রষ্টাচার ও আপোষ ঘটেছে সুফি মতবাদীরা তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দেশ এবং ভক্তি, ঐক্য ও সেবার আদর্শে যুক্ত থেকে এক মানবিক সংহত ভারতীয় সমাজ গড়ার আন্দোলনে নিজেদের নিয়োগ করেন সুফি মতবাদ মুসলমান ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার কথা বলে। মুসলমান সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করে হিন্দু মুসলিম যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ভাবনাকে প্রসারিত করতে চায় সুফিদের মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ হিন্দু ভক্তিবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। ভক্তিবাদ হল একেশ্বরবাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু উদার ভাবনা। রামানন্দ, কবীর, চৈতন্যদেব, নামদেব, গুরু নানক ইত্যাদিরা ভক্তিবাদী আন্দোলনকে প্রসারিত করেন।

সুলতানী আমলেই হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার সংমিশ্রণের জন্য সচেষ্ট হন প্রাদেশিক শাসকগণ। বাংলায় ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহ, কাশ্মীরের জৈনুল আবেদিন, বিজাপুরের আদিল শাহ, বিজয়নগরের দ্বিতীয় দৈব রায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির জন্য সচেষ্ট হন। মুসলিম শাসনকালে গ্রামের প্রচলিত শাসনপ্রথা, কৃষি প্রশাসন এসবের উপর তেমন আঘাত আসে নি। সংস্কৃত ভাষা চর্চা, উপনিষদ পাঠ, রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ এই যুগেই ঘটে। এই যুগে ফার্সী সাহিত্য, লোকভাষা ও লোক সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও পদাবলী সাহিত্য সুলতানী পৃষ্টপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়। শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এই সময়ে ইন্দো-মুসলিম সমন্বয়ের নিদর্শন লক্ষ্যণীয়।

মুঘল যুগে মুসলিম রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা :

ভারতে মধ্যযুগের রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পেতে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে এদেশের ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য তুঘলক বংশের রাজত্বকালেই পতনের মুখে পড়ে। তুর্কি নেতা তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ, দিল্লী লুণ্ঠন, সৈয়দ ও লোদী বংশের অযোগ্য শাসন, দাক্ষিণাত্যের বাহমনি সুলতানদের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী শাসন, বিজয়নগরের হিন্দু সংস্কৃতি সভ্যতা ও শাসনের সমৃদ্ধি ও প্রসার দিল্লী-সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে। মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকটের পরিস্থিতিতেই ধীরে ধীরে ভারতভূমিতে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে নেয় মুঘল রাজবংশ। তুর্কি ও মঙ্গল রক্তের মিশ্রণে পুষ্ট মুঘল রাজবংশের হাতেই ছিল মধ্যযুগের একটি দীর্ঘ সময়। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বা রণনৈপুন্য ও মানবিকতার গুণে বাবরের কৃতিত্বকে ছোট না করেও বলা যায় উপযুক্ত রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার নজির তিনি রাখতে পারেননি। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য শাসনের উপযুক্ত নীতি ও পন্থা তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন আফগান নেতা শের শাহ তাঁর অল্প কিছুকালের শাসনে। সাসারামে পৈতৃক জায়গীরের অধিকারী শের শাহ তাঁ অসাধারণ সাহস কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক প্রতিভার গুণে সে যুগে নিজেকে একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। মাত্র ৫ বছরের শাসনে (১৫৪০-১৫৪৫) যে বিরল কৃতিত্ব শের শাহ অর্জন করেন রাজনীতির গবেষক ও পাঠকের মনে তা গভীর ছাপ ফেলেছে। শের শাহের কৃতিত্বের পরিচয়টি হল—

(i) সুলতানী শাসনের মূল ধারাটি তিনি বজায় রাখেন এবং শাসন, সংগঠন ও রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করেন।

(ii) রাজতান্ত্রিক শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসন নীতির মূল ধারাটির পরিবর্তন না ঘটালে শের শাহ স্বৈরাচারী ছিলেন না। শাসনের সুবিধার জন্য সরকারকে পরগনা ও গ্রামে বিভক্ত করে এইসব অঞ্চলের শাসনের জন্য পৃথক কর্মচারী নিয়োগ করেন। পরগনা শাসনের জন্য মুন্সেফ, আমিন, শিকদার প্রভৃতি রাজকর্মচারীর পদ সৃষ্টি করেন তিনি। গ্রামের শাসনভার ছিল পঞ্চায়েতের হাতে।

(iii) বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির অনুসরণ, আদালতে আপীল ও শুনানীর ব্যবস্থা ও কঠোর দণ্ডনীতির প্রচলন শের শাহের শাসন নীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

(iv) আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক সংগঠন ও সংস্কার নীতি, সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত নীতি, গুপ্তচর ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করেন শের শাহ

(v) শের শাহের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় জনসংযোগ ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে। সেই আমলে রাস্তা নির্মাণ, সড়কপথ নির্মাণ সরাইখানা নির্মাণ, ডাক ব্যবস্থার যে নজির তিনি স্থাপন করেন আজকের দিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকের কাছেও তা অনুকরণযোগ্য।

(vi) শের শাহের ভূমি ও রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা আজকের দিনেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। ভূমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ, রায়তদের রায়তী, স্বত্ত্বদানে সুবিচার, নগদ টাকা বা ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়, আমিন, কানুনগো, পাটোয়ারী প্রমুখ রাজকর্মচারীর সাহায্যে রাজস্ব আদায়, প্রজাকে সরকারি পাট্টা (দলিল) দান, দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানির জন্য রাজস্ব মুকুব, জায়গীর প্রথার বিলোপ, দ্রব্যের উপর নিয়ম মাফিক শুল্ক ধার্য, রাজকর্মচারীদের নগদে বেতন দানের ব্যবস্থা যা তিনি করে যান তা আজকের দিনেও সমান গুরুত্ব লাভ করেছে।

(vii) শের শাহের বিশেষ কৃতিত্ব তার হিন্দুনীতি। মহম্মদ বিন তুঘলক ও সম্রাট আকবর এই দুই সুলতানের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সংযোগ চিহ্ন হিসাবে শের শাহ কাজ করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর মুঘল শক্তির পুন প্রতিষ্ঠা ঘটে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মুঘল সিংহাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে হুমায়ুন ব্যর্থ হন। তবে আকবরের সফল নেতৃত্বে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে মুঘল শাসনকে সংহত করতে সাহায্য করে।

আকবরের রাষ্ট্র শাসনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি আমরা নিম্নভাবে উল্লেখ করতে পারি—

(১) আকবরের বিনীত ও নম্র ব্যক্তিত্ব ও ভারসাম্য বিধানের বিষয়টি উল্লেখ্য। আকবর চান এমন এক রাষ্ট্র গড়তে যেখানে শান্তি ও সুশাসন থাকবে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর তিনি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু আকবর এইসব রাজ্যের মানুষের অধিকারকে সম্মানও জানান। একজন উদার ও দূরদর্শী শাসক হিসাবে তিনি বোঝেন যে ভারতে মুঘল শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ভারতীয়দের আস্থা অর্জন করতে হবে। তাই তিনি এদেশের রাজপুত রাজাদের মিত্রতা লাভ করতে সচেষ্ট হন। রাজপুত রাজাদের স্বায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার দিয়ে, রাজপুত রাজা পরিবারের সঙ্গে পরিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তার দরবারে রাজপুত রাজাদের মনসবদার হিসাবে নিয়োগ করে রাজপুতদের আনুগত্য লাভে সফল হন তিনি। আক্রমণ বা বিদ্রোহ দমনের চেয়ে অধীনতামূলক বশ্যতার নীতি প্রয়োগ, সন্ধি, অবরোধ, কূটনৈতিক প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার নীতিতে তাঁর আস্থা থাকার ফলে গন্ডোয়ানার রাজমাতা রানী দুর্গাবতী বা মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের মতো দু-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া আকবরের রাজপুতনীতি সফল হয়।

(২) আকবরের রাজ্য শাসনের আর একটি অভিনব পদ্ধতি ছিল তাঁর পরিষদীয় সৌজন্য ও গণসংযোগের নীতি। রাজা ও প্রজার মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে না তুলে তিনি সরাসরি প্রজার সঙ্গে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করেন।

প্রতিটি পেশা ও বৃত্তির মানুষকে রাষ্ট্রে প্রতি তাদের কর্তব্য ও অনুরাগকে সামনে রেখেই বিচার করা হত, তাদের ব্যক্তিগত, বংশগত বা ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে নয়।

(৩) গণমুখী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমান সঙ্গতি রেখে শাসননীতি ও কৌশলে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আকবর আনেন। নানা প্রতীকী কাজের মাধ্যমে, জনগণের সমস্যাকে জনগণের দৃষ্টি দিয়ে বোঝার মাধ্যমে আকবর নিজেকে মানুষের কাছে অপরিহার্য করে গেলেন। সুলতানী আমলে দিল্লী ছিল শাসন কেন্দ্র আকবর তাঁর কর্মকান্ডের কেন্দ্র প্রথমে দিল্লী থেকে আগ্রা ও পরে ফতেপুর সিক্রীতে স্থানান্তরিত করেন। সুতলান প্রাসাদ, দুর্গ, সাম্রাজ্য নগর বা রাজধানীর গৌরবে তাঁর গর্ব ছিল না। তাঁর গর্ব ছিল দেশ গঠন ও নির্মাণ কার্যের নতুন পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড নিয়ে। ফতেপুর সিক্রীর মধ্যে রূপ পেল তাঁর নব পরিকল্পনা।

(৪) আকবরের রাষ্ট্র শাসনের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে সামরিক ও প্রশাসনিক শিবির স্থাপন। তুর্কি ও মোঙ্গল রাজাদের অস্থায়ী সামরিক শিবির স্থাপনের ব্যবস্থাকে আকবর পুনর্জীবিত করেন তাঁর ভ্রাম্যমান রাজধানী স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

(৫) আকবরের রাষ্ট্র শাসনের পেছনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে এক রাজতান্ত্রিক মতাদর্শ আকবর ও তাঁর সহযোগী বন্ধু ছিলেন এই মতাদর্শের প্রধান প্রবক্তা। আবু ফজল আকবরকে সামনে রেখে তৈম্যুর বংশীয় এক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন যার লক্ষ্য ছিল আকবরের বিরুদ্ধবাদীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা এবং সম্রাটের বৈধতার প্রচার করা। আকবরের সাম্রাজ্য ও শাসনের ৪৭ বছরের বাৎসরিক বিবরণ সম্বলিত বিরাট গ্রন্থ 'আকবরনামা', সাম্রাজ্যের কার্যবিবরণী প্রচার পুস্তক হিসাবে পরিচিত ৩ খন্ডের আইন-ই-আকবরী মুঘল রাজবংশের কৃতিত্বের এক খতিয়ান।

(৬) আকবরের কৃতিত্বের একটি বিশেষ দিক হল গুণীর সমাদর। তিনি শুধু সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নি, তাঁর সভায় নানা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন। বীরবলের বুদ্ধি, মানসিংহের সামরিক জ্ঞান, টোডবমলের রাজস্ব সংস্কার দক্ষতা, হাকিম হুকুমের দায়িত্বশীলতা, মোল্লা দোপিয়াজার কৌশল, ফৈজীর কাব্যরস, আবুফজলের রাজনীতি জ্ঞান, আবদুর রহিমের কর্মদক্ষতা, তানসেনের সংগীত প্রতিভা নিয়ে আকবরের রাজসভা অলংকৃত হয়েছে। নবরত্নের সাহায্য ও সহযোগিতা সাম্রাজ্য গঠন ও সংস্কারের কাজে তাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

(৭) আকবর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তাঁর সংস্কার নীতির জন্য। রাজনৈতিক গবেষকের দৃষ্টিতে আকবরের হিন্দুনীতি, ধর্মসহিষ্ণুতা, শাসননীতি, রাজস্ব নীতি, বিচার ব্যবস্থা তাঁর রাজনৈতিক বাস্তব বুদ্ধির উজ্জ্বল পরিচয়। সুলতানী যুগে রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দু প্রজাদের যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল শাসকের গোঁড়া ধর্মনীতির জন্য, আকবর তাঁর সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সেই ব্যবধান দূর করতে সচেষ্ট হন। পূর্বেকার মুসলমান শাসনে হিন্দু বিরোধী যে সব প্রথা ছিল আকবর সে সব প্রথার বিলোপ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হিন্দুদের ক্রীতদাসে পরিণত করা, হিন্দু তীর্থযাত্রীর উপর কর আদায় করা, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপের প্রথা আকবর নিষিদ্ধ করেন। সরকারি পদে যোগ্যতার ভিত্তিতে হিন্দুদের নিযুক্ত করা, হিন্দু ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আকবরের সমাজ সংস্কারের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

(৮) আকবরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার ব্যবস্থা। আকবর ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অনুরক্ত, ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। এক্ষেত্রে সুফি ভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। আকবর তাঁর নব ধর্মমত 'দীন-ই-লাহির' মধ্যে সব ধর্মের সমন্বয়ের কথা প্রচার করেন। এই ধর্ম কোন নিয়ম বা ধর্মীয় আচারের বন্ধনে সীমাবদ্ধ ছিল না। সত্য অনুসন্ধান ও উদারতাই ছিল এই ধর্মের মূল কথা। দান, ধ্যান, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য মানবতা, সংযম ছিল এই ধর্মের শিক্ষা। মুসলিম সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নীতিকে ধ্বংস করার জন্য তিনি 'মজহর' নামে এক ঘোষণপত্র (আদেশনামা) জারি করেন। এই আদেশ অনুসারে শরিয়ত ও কোরাণের ব্যাখ্যা নিয়ে

উলেমাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে সম্রাটের দেওয়া ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আকবরের ধর্ম সহিষ্ণুতার মূল বাণী হল 'সুল-ই-কুল' অর্থাৎ সকলের জন্য শান্তি (Peace for all)। শান্তির বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য অর্জন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

(৯) আকবরের শাসন সংস্কারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি মনসবদারী-প্রথার সংস্কার। মনসব অর্থ হল পদমর্যাদা। আকবর এই পদমর্যাদার ভিত্তিতে তাঁর সেনা ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের সংগঠিত করেন শুধুমাত্র রাজ পরিবারের লোকেরা নয়, আকবরের আমলে হিন্দু প্রজা ও বিশ্বাসভাজন যে কোন কর্মচারীই মনসবদার পদ লাভ করতে পারতেন। মনসবদারের সর্বনিম্ন স্তর ছিল ১০টি সওয়ারের পদমর্যাদাযুক্ত মনসবদার এবং সর্বোচ্চ ছিল ১০ হাজার সওয়ারের পদমর্যাদাযুক্ত মনসবদার। টোডরমল, মান সিংহ, আবুল ফজল, আবদুর রহিম প্রভৃতিরা ছিলেন আকবরের বিশ্বাসভাজন উর্ধ্বতন মনসবদার। আকবর এই মনসবদার প্রথাকে শাসক ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেন।

(১০) আকবর যে সামগ্রিক প্রশাসনিক আমলা বাহিনীর সৃষ্টি করেন তার লক্ষ্য ছিল সম্রাটের আস্থাভাজন, অনুগত একদল প্রভাবশালী কর্মীকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যের শাসকের বৈধতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এইসব কর্মচারী তাঁদের কাজের উপযুক্ত বেতন পাবেন, পদ ও মর্যাদা লাভ করবেন এবং বিনিময়ে সম্রাটের সাম্রাজ্য রক্ষা ও দেশের সমৃদ্ধির স্বার্থে নিজেদের নিয়োগ করবেন। আকবর সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে সুবা সরকার, পরগণা, গ্রাম এইভাবে উঁচু থেকে নিচু প্রশাসনিক ভাগ করে ছিলেন। প্রাদেশিক কাজকর্মের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন সুবাদার, দেওয়ান, বকসী, কাজী, ফৌজদার এই সব কর্মচারীদের হাতে।

(১১) আকবর শের শাহের নীতি মেনেই ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। টোডরমলের সহায়তায় রাজস্ব বিভাগের যে সংগঠন তিনি করেছেন তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল (ক) জমির নির্ভুল জরিপ, (খ) উর্বরতা অনুসারে জমির শ্রেণীবিন্যাস, (গ) ভূমির শ্রেণীভেদে রাজস্ব নির্ধারন, (ঘ) নগদ টাকা বা ফসলে রাজস্ব আদায়, (ঙ) উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে নির্ধারন। আকবরের আমলে জায়গীর প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। জিজিয়া কর তুলে দেওয়া হয়। আকবর চান শান্তি ও সংহতির আদর্শ মেনে আইনের পথে, সমতার নীতিতে রাজ্য পরিচালিত করত, তিনি নিজেকেই তাঁর রাজ্যের আইনের সুবিচারক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চান। দরবারে বসেই প্রজার অভাব-অভিযোগ শোনা ও সুবিচার করার রেওয়াজ গড়ে তোলেন তিনি। কাজী-উল-কাজত, মুফতি মীর আদল প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা আইনের ব্যাখ্যা ও রায়দানের কাজে নিযুক্ত হলেও সম্রাটই হন ন্যায় বিচারের উৎস।

আকবরের সমাজ সংস্কার ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃত্বকে খুশি করতে পারেনি। রক্ষণশীল মুসলমান লেখক আবদুল কাদির বাদাউনি আকবরের 'মজহর' ঘোষণাপত্র এবং 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্মমতের সমালোচক ছিলেন। আকবরের বিরুদ্ধে এই সব সমালোচনা রক্ষণশীল মুসলিম গোষ্ঠীর বলে উদারনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা উল্লেখ করেন। প্রাচীন ভারতের অশোকের মতোই মধ্য যুগের ভারতে আকবরের ভূমিকা রাষ্ট্র ও রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ গবেষকদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। দিল্লী সুলতানের রক্ষণশীলতা নয়, মোঘল শাসনের উদারতা, নৈতিকতা, মানবিক শাসনের স্বপক্ষে এক রাজনৈতিক দলিল রচনা করেন আবু ফজল। কিন্তু আকবরের সাম্রাজ্য শাসনের গণতন্ত্র ও উদারভাবনা পরবর্তীকালের মুঘল শাসকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। জাহাঙ্গীর বা শাহজাহানের আমলে মুঘল দরবারে জাঁকজমক বা আড়ম্বর যতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজ্যশাসনের বা সাম্রাজ্যে রক্ষার ব্যবস্থা ততটাই শিথিল হয়ে পড়ে।

শাহজাহানের জীবিতকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বংশধরদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেবের কর্মদক্ষতা বা সামরিক প্রতিভা ছিল ঠিকই কিন্তু আকবরের উদারনীতি সংস্কার নীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি

তাঁর আমলে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি কঠোর শরিয়তিনীতি প্রবর্তন করতে চান।

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির জাগরণ ও সাফল্য ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত রাজনীতিরই ফল। শাসকের যে বৈধতা দিল্লী সুলতান ও আকবরের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির যে অনুকূল পরিবেশ সম্রাট আকবর গড়ে তুলেছিলেন ঔরঙ্গজেব সেগুলিকে ব্যর্থ প্রমাণ করেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ফল হল রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুশক্তি জাঠ, মারাঠা, রাজপুত ইত্যাদির বিদ্রোহ। রাজপুতদের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে আকবর মুঘল শক্তির অনুকূলে রাজপুতদের সামগ্রিকভাবে মিত্রতা আদায় করতে পেরেছিলেন। ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের এই অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের অসন্তোষ ও বিরুদ্ধতার মুখে পড়েন। সার্বভৌম শাসক হিসাবে ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতা দীর্ঘকালের অখন্ড মুসলিম সাম্রাজ্য শাসনের (সুলতানী ও মুঘল সাম্রাজ্য) ধারার প্রস্থান ঘটাতে সাহায্য করে এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গড়ে ওঠে এক হিন্দু জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্য। সনাতন হিন্দু কৃষি ও গ্রামীণ সংগঠনের সঙ্গে মুঘল সামরিক ও আইনি বিচার সংগঠনকে যুক্ত করে, হিন্দু ধর্মীয় ও ভক্তিবাদী ধারার সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের সংস্কারবাদী প্রবণতাকে মিলিয়ে গড়ে ওঠে মারাঠা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র।

এই রাষ্ট্রের পেছনে মুঘল বা তার পূর্ববর্তী সুলতান রাষ্ট্রের মতো কোন সংহত মতাদর্শ ছিল না। এককথায় মারাঠা হিন্দু সাম্রাজ্য বলে কোন অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারে নি শিবাজীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। মুসলিম ও মারাঠা শক্তির বিপর্যয়ে সুযোগেই ধীর ধীরে ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। সার্বভৌমিকতা ও রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মতাদর্শ প্রবেশাধিকারে সুযোগ পায়।

৭.৪ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) আরবদের সিন্ধু আক্রমনের পর মুসলিম রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের চিত্র কেমন ছিল?

খ) সুলতানী আমলে সামাজিক, মানবিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক গুলিতে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?

৭.৫ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

i. Habib, Mohammad., & Khan, Afsar Umar Salim. (1961). *The Political Theory of the Delhi Sultanate: including a translation of Ziauddin Barani's Fatawa-i Jahandari, circa, 1358-9 A.D.)* . Allahabad: Kitab Mahal.

ii. Prasad, Ishwari. (1965). *A Short History of Muslim Rule in India- From the Conquest of Islam to the Death of Aurangzeb* . Allahabad: The Indian Press.

iii. Tripathi, R. P. (1936). *Some Aspects of Muslim Administration.* Allahabad: The Indian Press.

পাঠক্রম : ১.৩

Unit-8

আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি'-র ধারণা
Akbar's Concept of Din-i-ilahi

বিষয়সূচী

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৮.২ ভূমিকা

৮.৩ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' ধারণা

৮.৪ আকবরের ধর্মনীতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রভাব সমূহ

৮.৫ আকবরের ধর্মনীতি : বিবিধ পর্যায় সমূহ

৮.৫.১ প্রথম পর্যায় : নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলিম

৮.৫.১ দ্বিতীয় পর্যায় : ইবাদৎখানা ও মাহজার নামা

৮.৫.৩ তৃতীয় পর্যায় : 'দীন-ই-ইলাহি'

৮.৬ মূল্যায়ন

৮.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৮.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ভারতের মধ্যযুগের রাজনীতির বিবর্তনে ধর্মচিন্তার আঙিনায় সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' ধারণার প্রেক্ষাপট, চরিত্র, বিষয়বস্তু এবং প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আলোচ্য এককটি পাঠের পর ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির বিবর্তনে শাসকের হাতে ধর্মের ব্যাখ্যা এবং সমকালীন সময়ের স্রোতে তার পসির ও শাসকের মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

৮.২ ভূমিকা

মধ্য যুগের ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে আকবরের শাসনকাল নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের মধ্যে আকবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা উদার ও পরধর্মমত-সহিষ্ণুতার প্রবর্তক। ভারতবর্ষে তিনি প্রথম মুসলিম শাসক যিনি রাজনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করেন এবং রাষ্ট্রকে মুসলিম ধর্মগুরুর তথা উলেমাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভারতকে আধুনিক অর্থে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হন। ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক যিনি

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় চেয়েছিলেন। স্বপন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনকালে আকবরের মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব আর কেউ নেই। আজও এই বিতর্কের অবসান হয়নি। সম্পূর্ণ দুই বিপরীত মেরু থেকে আকবরকে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রমাণ করা যায় তিনি নিষ্ঠুর, বিবেকহীন, ব্যভিচারী, কুটিল ও দাম্ভিক নীতিহীন শাসক; আবার প্রমাণ করা যায়, তিনি উদার, বীর, সহানুভূতিসম্পন্ন, প্রজাবৎবল বিবেকী শাসক। দুটি বিশ্লেষণের কোনটাই মিথ্যে নয়''। আসলে আকবর কে নিয়ে ভারতের অপরাপর প্রশাসকদের মতো চর্চা হয়েছে বিস্তর এবং এই সকল গবেষণার হাত ধরে উঠে এসেছে নানা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। তবে সব মিলিয়ে বলা যায়, আকবরের ধর্ম নীতি ছিল তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিত অগ্রণী সিদ্ধান্ত। আকবরের ধর্মনীতি তাঁর শিশুকাল থেকে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ অব্দি দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বিশ্ব মানবতাবোধে পরিণতি লাভ করেছিল।

৮.৩ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' ধারণা

আকবরের ধর্ম ও নৈতিক জীবনের বিবর্তনের চরম পরিণতি ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'দীন-ই-ইলাহি' নামে এক সুগভীর দর্শন ভিত্তিক ও উদার মতবাদের ঘোষণার মধ্য দিয়ে, যেটি তার আলো দেখতে পেয়েছিল 'দীন-ই-ইলাহি'-র মধ্য দিয়ে। তবে 'দীন-ই-ইলাহি' সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা লাভ করতে হলে আকবরের ধর্মনীতির সামগ্রিক দিক সমূহ জানতে হবে, বিশেষ করে আকবরের ধর্ম চিন্তার উপর প্রভাব এবং এর সামগ্রিক বিবর্তন এর উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

৮.৪ আকবরের ধর্মনীতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রভাব সমূহ

আকবরের ধর্ম মতের মধ্যে যে পরধর্ম সহিষ্ণুতা, উন্নত পরিকল্পনা ও মহান ভাবাদর্শ দেখা যায়, তা নানা কারণে গড়ে উঠেছিল। তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, তৎকালীন যুগধর্মের তুলনায় এক উদার পরিমন্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আকবরের চিন্তার উপর প্রভাবশালী উপাদানগুলি হল— প্রথমত, সুলতানি যুগের ভক্তিবাদীগণ এবং পরে সুফিবাদীরা, বিশেষত নানক, কবির ও চৈতন্যদেব তাঁদের বিপ্লবাত্বক উদার চিন্তাধারার মাধ্যমে ভারতীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করে, মানুষের মিলন ও সহনশীলতা এবং সহাবস্থানের এক অভূতপূর্ব বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। এই সমন্বয়বাদী আদর্শ আকবরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, প্রাদেশিক অনেক শাসক এই ধরনের আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও আকবরের পূর্বে কেন্দ্রীয় স্তরে এভাবে সমন্বয়ের চিন্তা কখনও ভাবা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, আকবরের পিতা ও পিতামহ ছিলেন 'সুন্নি' এবং তাঁদের কোনও ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর মাতা হামিদাবান বেগম ছিলেন পারস্যের উদারমনা 'শিয়া' মৌলবি মির বাবদোস্ত-এর কন্যা। আকবরের জন্ম হয়েছিল অমরকোটের এক হিন্দু নরপতির গৃহে এবং শৈশবে কয়েকমাস এই হিন্দু গৃহেই মহারানির স্নেহচ্ছায়ার তিনি লালিত হন যা তাঁর মনে নানা ধরনের উদার প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয়ত, তাঁর শৈশবের কিছু সময় তিনি যখন কাবুলে ছিলেন তখন পারস্য থেকে বহু সুফি সাধক ও পণ্ডিত আসত, তিনি তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এর ফলে সুফি দর্শন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে সেলিম চিস্তি ও খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির প্রতি তার গভীর আগ্রহ তা প্রতিফলিত হয়েছিল।

চতুর্থত, স্বীয় রাজপুত মহিষীদের প্রভাব এবং তাঁর সভার সভাপদ বন্ধুপ্রতিম আবুল ফজলের পিতা সেখ মুবারক ও ভ্রাতা ফৈজির প্রভাব আকবরের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাছাড়া আকবর রাজ্য জয় ও রাজকার্যে ব্যস্ত থাকলেও, আবুল ফজল ও বদায়ুনের কাছ থেকে জানা যায় যে, তিনি ছোটবেলা থেকেই সত্যকে জানার জন্য উন্মুখ থাকতেন, এমনকি

কৈশোরেও কখনও কখনও সৈন্য শিবির ছেড়ে তিনি ধ্যানস্ত হয়ে পড়তেন। ফলে ঈশ্বর বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল যা বড় হয়ে আরও গভীরতা পেয়েছিল।

পঞ্চমত, আকবর ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। রাজ্য জয় ও রাজ কাজে ব্যস্ত থাকলেও বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্ম চিন্তা করতেন। শিয়া, সুন্নি, সুফি, আল-মাহাদী নানাবিধ ইসলামীয় সম্প্রদায়ের অন্তঃকলহ এবং হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইসলামের তীব্র বিরোধ তাঁকে প্রবলভাবে চিন্তান্বিত করত। এই সব বিরোধ এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও সত্যকে জানার আগ্রহ তাঁকে অস্থির করে তুলত। এই অস্থিরতা থেকেই তিনি ছুটতেন অনেক সাধু সন্তের দরগায়। যা তাঁর ধর্ম বোধ তৈরিতে সাহায্য করেছিল।

ষষ্ঠত, আকবরের গৃহ শিক্ষক মির আবদুল লতিফ বাল্যেই তাঁর হৃদয়ে উদারতার বীজ বপণ করেছিলেন এবং তাঁকে 'সুল-ই-কুল' তথা 'সার্বজনীন শান্তি ও সহিষ্ণুতা'র আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন।

এইভাবে আকবর এর উপর নানাবিধ প্রভাব তাঁর ধর্ম ধারণা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আকবরের ধর্ম চেতনার পর্যায় ক্রমিক বিবর্তন এর একেবারে শেষ পর্বে 'দীন-ই-ইলাহি'-এর ধারণা উঠে এসেছিল।

৮.৫ আকবরের ধর্মনীতি : বিবিধ পর্যায় সমূহ

আকবরের জীবনের ধর্মনৈতিক বিবর্তনকে গবেষক ও বিশ্লেষক গণ তিনটি দিক থেকে দেখিয়েছেন। আমরা নিচে পর্যায়ক্রমে তিনটি পর্বকে তুলে ধরলাম।

৮.৫.১ প্রথম পর্যায় : নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলিম

আকবরের ধর্ম ধারণার প্রথম পর্যায় স্বরূপ ঐতিহাসিকরা ১৫৬০ থেকে ১৫৭৫ সালকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আকবর এই সময় নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এবং ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতেন। এই সময় তিনি খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির 'রওজা'য় প্রতি বছরই তীর্থ যাত্রী রূপে যেতেন। আকবর কখনও তাঁর পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতি থেকে সরে যান নি। এই সময়ে কখনও তিনি সংকীর্ণ মনের বা গোঁড়ামির পরিচয় দেন নি। তাঁর সময়েই এমন ঘটনা ঘটেছিল, যেগুলি তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের ভীত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। এই সময়েই অর্থাৎ, ১৫৬২ সালে তিনি আজমীর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ১৫৬৩ সালে 'তীর্থযাত্রী কর' ও ১৫৬৪ সালে তাঁর স্বধর্মীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু বিতর্কিত 'জিজিয়া কর' তিনি রহিত করেছিলেন। এইভাবে এক উদার ধর্মীয় পরিবেশ ও বাতাবরণ তাঁর সাম্রাজ্যে সম্রাট আকবর শুরু করেছিলেন।

৮.৫.২ দ্বিতীয় পর্যায় : ইবাদৎখানা ও মাহজার নামা

এই পর্বে আকবরের উদার ধর্মীয় বোধ ও ভাবনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ দেখা যায়। মূলত ১৫৭৫ থেকে ১৫৮০ সালের কালপর্বকে গবেষকগণ দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। এই সময় তাঁর সভাসদদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে ইবাদৎখানা স্থাপন ও মাহজার নামা ঘোষণা করেন।

ধর্ম ও দর্শনের মূল বিষয়গুলি আলোচনা এবং ধর্মের বাস্তব সত্য ও উৎস নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৫৭৫ সালে রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে তিনি ইবাদৎখানা নামে এক ধর্মীয় উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন। সূচনা পর্বে দেখা যায় সেখানে শুধু মুসলিম ধর্ম জ্ঞানীদেরই আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই আলোচনা সভা বসত। মুসলিম ধর্ম জ্ঞানীদের আলোচনা সভা খুব দ্রুত ব্যক্তিগত দিকে মোড় নেয়। সেখানে মুসলিম ধর্ম ব্যাখ্যাকারীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা ও

আক্রমণ শুরু করেন। ক্ষুদ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর সাময়িকভাবে তা বন্ধ করে দেন। তবে কিছুসময় পর তিনি ১৫৭৮ সালে ইবাদৎখানা আবার খুলে দেন এবং ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার জন্য সব ধর্মের মানুষকে আহ্বান করেন। শিয়া, সুন্নি, হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, পারসি, জরাথুস্টিয় প্রভৃতি ধর্মের জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে সেখানে আহ্বান করা হয়। এর ফলে ইবাদৎখানা এক যথার্থ ধর্ম সংসদে পরিণত হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ-এর ভাষায় বলা যায়, ইবাদৎখানা "First World Religious Parliament" এ পরিণত হয়। এখানে জরাথুস্ত্র দেবের অনুগামী অগ্নি-উপাসক পার্শি পণ্ডিতরা এবং গোয়া থেকে আগত জেসুইট পাদ্রীরা নিজ ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য আমন্ত্রিত হন। আসলে এক্ষেত্রে আকবরের উদ্দেশ্য ছিল তুলনামূলক ধর্ম আলোচনার দ্বারা বাস্তব সত্য উদ্ঘাটন করা। এই ধর্মে সভার বিভিন্ন পণ্ডিতদের আলোচনা ও মতামত আকবর অনেক শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন এবং নিজ কোনও মন্তব্য করতেন না। ইবাদৎখানায় আলোচিত বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এবং তাঁর নিজ বৌদ্ধিক সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্খা থেকে তিনি বিবিধ ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়ের সাধনাকে গ্রহণ করেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি তাঁর উপর নানাবিধ প্রয়োগও ঘটান।

এই সময় আকবরের ব্যক্তিগত জীবনের আচার-ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন আসে। তিনি নিরামিষ আহার শুরু করেন বলে অনেকে লিখেছেন। কপালে তিলক কেটে রাজ দরবারে আসতে শুরু করেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের শখ শিকার করা, তা তিনি নিজে স্বয়ং বন্ধ করেন এবং নিষিদ্ধ করেন। তবে আকবরের এহেন ব্যক্তিগত আচরণকে উলেমারা ইসলাম ধর্ম বিরোধী বলে অভিহিত করেন এবং তাঁরা তাঁকে বিধর্মী বলতেও দ্বিধা বোধ করেননি। তখন আকবর এই ঘটনাকে রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করে দেখেন যে, যদি ধর্মের ব্যাপারে উলেমারাদের বক্তব্য চূড়ান্ত হয়, তাহলে তাঁর সার্বভৌম রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বিপন্ন হবে। ফলে তিনি ধর্মীয় পরিসরে কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তিনি ১৫৭৯ সালের জুন মাসের শেষের দিকে ফতেপুর সিক্রির মসজিদের প্রধান ইমামকে অপসারিত করে স্বয়ং উপাসনা পরিচালনা করেন এবং ফৈজির লেখা 'খুৎবা' নিজ নামে পাঠ করেন। 'খুৎবা'র বক্তব্য গোঁড়া উলেমাদের প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ করে। তাঁদের ক্ষোভ বিস্ফোরিত হবার আগেই ১৫৭৯ সালে ২রা সেপ্টেম্বর তিনি শেষ মোবারক রচিত এক 'মাহজারনামা' বা 'ঘোষণাপত্র' জারি করে বলেন যে, তিনিই হলেন ইমাম-এ-আদিল' বা ইসলামিক আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার এবং তাঁর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ের প্রধান। তিনি বলেন যে, ইসলাম ধর্ম বা কোরানের কোনও ব্যাখ্যা নিয়ে উলেমাদের মধ্যে মতপার্থক্য সামনে এলে সম্রাটই শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন। এইভাবে ঐশ্বরিক মতবাদের এক চূড়ান্ত স্বাক্ষর আমরা মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার আকবরের শাসনকালে পাই। শুধু একথা বলা যায় যে এর প্রয়োগ মেয়াদ ছিল স্বল্পকালীন। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্মিথ মনে করেন যে এই ঘোষণার দ্বারা আকবর একই সঙ্গে পোপ ও সিজারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গবেষকের ভাবনায় তিনি এই ঘোষণাকে 'অভ্রান্ত নির্দেশনামা' (Infallible Decree) নামে অভিহিত করেছেন।

অনেকে মনে করেন, আকবর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনে ব্রতী হয়েই 'খুৎবা' ও 'মাহজরনামা' ঘোষণা করেন। আকবরের ১৫৭৫ সাল থেকে ১৫৮০ সাল পর্যন্ত কার্যকলাপ ধর্মীয় পরিসরে যথেষ্ট বিতর্কিত এবং গবেষকগণ নানা রকমের মতামত ও বক্তব্য রেখেছেন। আমরা বর্তমান সমাজ ও রাজনীতির বাতাবরণকে মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত ধারণা এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আকবর যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি উপরের দুটি ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে ধর্ম ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ান। তৎকালীন সমাজ পরিস্থিতিতে উলেমাদের ভূমিকায় তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কারণে তাঁর ধর্ম ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার চিন্তা আসে। তবে 'খুৎবা'য় আকবরের মহত্ব ঘোষণা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আছে। খুৎবা পাঠের শেষে 'আল্লাহু-আকবর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে বলেছেন যে, আকবর 'আল্লাহু-আকবর' এই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে 'ঈশ্বর মহান' না বুঝিয়ে 'আকবর ঈশ্বর' একথাই প্রচার করতে চেয়েছেন। যাই হোক না কেন আকবর নিজেকে কখনও ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেননি।

আকবরের ধর্মনৈতিক জীবনের বিবর্তনে এই পর্ব ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বেই মূলত তাঁর এই বিশ্বাস জন্মায় যে, কোনও ধর্মই অভ্রান্ত সত্য বলে দাবি করতে পারে না—এমনকি ইসলামও এই দাবি করতে পারে না। আকবরের ধর্মনৈতিক জীবনে এই বোধ তাঁকে আরেক নতুন সত্যের সামনে এনে দাঁড় করায় যার হাত ধরে তাঁর 'দীন-ই-ইলাহি' ধারণা সামনে আসে। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন, 'মহজরনামা' ছিল 'দীন-ই-ইলাহি' ঘোষণার অগ্রদূত।

৮.৫.৩ তৃতীয় পর্যায় : 'দীন-ই-ইলাহি'

আকবরের ধর্মীয় চিন্তার শেষ পর্যায় হল ১৫৮১ সালে 'দীন-ই-ইলাহি' নামে এক একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তন। সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে এই ধর্ম মত গঠিত এবং এই ধর্ম মতে কোনও সাম্প্রদায়িকতা, অন্ধ বিশ্বাস, দেবতা, দেব-মন্দির, পুরোহিত বা ধর্মগ্রন্থের স্থান ছিল না—স্বয়ং সম্রাটই ছিলেন এর প্রবক্তা এবং যে কোনও মানুষ এই ধর্মমত গ্রহণ করতে পারত।

আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরির ৭৭ নম্বর আইন এ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি'-র মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে বদায়ুন ফজলের থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়েছে। জেসুইট পাদরীদের বিবরণও খুব নির্ভরযোগ্য নয় বলে অনেকে বলেন। আসলে 'দীন-ই-ইলাহি'-র কোনও লিখিত ধর্মগ্রন্থ না থাকায়, আকবর এর দ্বারা কি করতে চেয়েছিলেন তার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া, এই ধর্মমত প্রচারের জন্য আকবর কোনও প্রচারক বা পুরোহিত নিয়োগ করেননি।

একথায় অপর ধর্মকে সহ্য করাই হল 'দীন-ই-ইলাহি'-র মূল নীতি। তবে ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টানসহ নানাবিধ ধর্মের সার বস্তু নিয়ে 'দীন-ই-ইলাহি' গঠিত হয়। এই ধর্মে বিশ্বাসীদের কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য—দান ধর্ম পালন করা, গো-মাংস ভক্ষণে বিরত থাকা, পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে 'আল্লাহু-আকবর' অর্থাৎ ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং প্রত্যুত্তরে 'জাল্লা জালাল্লাহু' অর্থাৎ তাঁর মহিমা বিকশিত হোক, এই বলে সম্ভাষণ করা। অনেকে মনে করেন এই ধর্ম গ্রহণ করলে, সম্রাটের জন্য সম্পদ, মান, ধর্ম ও জীবন বিসর্জন শপথ গ্রহণ করতে হত। মূলত যুক্তি আশ্রিত ধর্ম ছিল এটি। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন, "Its basis was rational; it uphold no dogma, recognized no God; or prophets"।

দীন-ই-ইলাহি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বরং বলা যেতে পারে আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এই ভাবনা বাস্তব ক্ষেত্রে আর প্রসারিত হয় নি। এই ভাবনা এতটাই তাত্ত্বিক ছিল যে, কেবলমাত্র আঠারো জন বিশিষ্ট মুসলিম ও একজন বিশিষ্ট হিন্দু বীরবল এই ধর্মমত গ্রহণ করেন। 'দীন-ই-ইলাহি' আকবরের ইচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যেই পুষ্ট হয়। এর মধ্য দিয়ে আকবরের কোনও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেভাবে পূরণ না হলেও বলা চলে মধ্য যুগের ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত সমাজে সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আকবরের উদারতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

৮.৬ মূল্যায়ন

বর্তমানে আলিগড় ঐতিহাসিকদের অনেকে আকবরের ধর্মনৈতিক জীবনের বিবর্তনের এক অনালোচিত অধ্যায় আলোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, আকবরের ধর্মনীতির পশ্চাতে উদারনৈতিক মনোভাব ছিল না। তিনি যা করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে করেছেন। তাঁর মতে, মুঘল-দরবারে রাজপুতদের যে সম্মানিত সদস্য হিসেবে আকবর স্থান দিলেন, তা কোনও বৌদ্ধিক প্রভাবে বা বিচারে নয়। বরং রাজকাজে ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে তিনি তা করেন। অন্যদিকে স্মিথ মনে করেন, এই নব ধর্মমত আকবরের বুদ্ধিহীনতার স্তম্ভ ছিল। ("The Divine Faith was a monument of Akbar's folly, not of his wisdom. The whole scheme was the outcome of ridiculous vanity, monstrous growth

of unrestrained autocracy"--Smith) তবে অনেকে তা মানেন না। বিশেষ করে কালি কিঙ্কর দত্ত মনে করেন তাঁর আদর্শ ছিল 'সুল-ই-কুল' বা সকল ধর্মের সারসমন্বয় করে একটি জাতীয় ধর্ম গড়ে তোলা। (His ideal was a grand synthesis of all that he considered best in all religions-an ideal essentially national." - Dr. K. K. Dutta)। আসলে দীন-ই-ইলাহি এমন এক আদর্শ স্থাপন করে যাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও জনসাধারণ এক সাধারণ বেদিতে মিলিত হতে পারে। বাস্তবে দেখা যায় তাঁর ধর্মীয় চিন্তা সম্রাটের আসন কে একটি আধ্যাত্মিক জ্যোতিরবলয় রচনা করে নিঃসন্দেহে আকবরের হাতকে শক্তিশালী করে। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ যথেষ্ট পরিমানে স্তিমিত হয়, রাষ্ট্র কর্মে উলেমা ও মোল্লাদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমানে খর্ব হয় এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সম্রাটের সর্বময় অধিকার ও কতত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

আকবর তাঁর দূরদর্শিতায় সময়ের ও আগে গিয়ে বুঝেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিজ নিজ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কার বজায় রেখে সাধারণভাবে মিলন সম্ভব নয়। এ কথা যে সত্য তা বর্তমান সময়ের নিরিখেও আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। তাই উভয় ধর্মের মধ্যে ঐক্য গড়ে ভারতবর্ষকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ধর্মীয় বিভেদের বাঁধা কাটাতে 'দীন-ই-ইলাহি'র মতো ধারণা তথা ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

৮.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে লেখ।

খ) 'দীন-ই-ইলাহি' বলতে তুমি কি বোঝ?

গ) আকবরের ধর্মনীতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রভাব সমূহ লেখ।

ঘ) আকবরের ধর্মনীতির বিবর্তনের পর্যায় সমূহের বিশ্লেষণ কর।

ঙ) আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি' ধারণার মূল্যায়ন কর।

৮.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Prasad, Ishwari. (1965). *A Short History of Muslim Rule in India- From the Conquest of Islam to the Death of Aurangzeb.* Allahabad: The Indian Press.

ii. Chandra, Satish. (1993). *Mughal Religious Policies: the Rajputs and the Deccan* . New Delhi: Vikas Publishing House.

iii. Majumdar, R. C.., Raychaudhuri, Hemchandra., & Datta, Kalikinkar. (1967). *An Advanced History of India.* London: Macmillan.

iv. Sharma, Shri Ram. (1940). *The Religious Policy of the Mughal Emperors.* Oxford University Press.

v. Smith, Vincent. (1918). *Akbar the Great Mogul.* New York: Oxford University Press.